লোক প্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

কাজী হাসান ইমাম

কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

মোঃ শফিকুল হক

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ মোঃ শফিকুল হক

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৬

টেলিফোন	ঃ	৯৩৫১৭২০, ৯৩৫১৭২৮ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৯৩৩২০১৬
ই-মেল	ঃ	bpatch @ bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	হাই-টেক কম্পোজিং এণ্ড প্রিন্টিং লিঃ ১৪৭, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৯৩৩৭৯০২, ৯৩৫১৪৯৫

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 14, December, 1999 Pouse, 1406
Quarterly Jurnal of
Bangladesh Public Administration Training Centre
Editor : Md. Shafiqul Haque
© Bangladesh Public AdministrationTraining Centre 1406
Telephoen	:	9351720, 9351728 (PABX)
Telex	:	632228 PATC BJ
FAX	:	9332016
E-Mail	:	bpatc @ bangla.net
BPATC Library	:	315.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen Only

লোক প্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ব্রিটিশ ভারতে সিভিল সার্ভিসের সংস্কার *একটি পর্যালোচনা* ১
মোঃ শরীফ হাছান

বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য এবং রপ্তানী নীতি *একটি পর্যালোচনা* ১৭
খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব

'উন্নয়ন' ধারার ২৭ বছরঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি, ৩৫
রাষ্ট্র ও-সমাজের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ
আনু মুহাম্মদ

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা ৭৫
মোঃ শফিকুল হক

Looking BTMC Through World Bank Mirror 89
Md. Tofazzel Hossain

The Ozone Layer Depletion 115
International Response and Bangladesh
A. K. M. Nashirul Huq

Poverty and Housing Linkages: A Case Study 135
of Pavement Dwellers in Dhaka Mega- City
Syed Shamsul Alam

Purchase, Sales and Store Management 147
Md. Shah Alam Ghazi

ব্রিটিশ ভারতে সিভিল সার্ভিসের সংস্কার
একটি পর্যালোচনা

মোঃ শরীফ হাছান

Reforms in British Indian Civil Service : *A Review*

Md. Sharif Hasan

Abstract: British dominance in India began since June 23, 1757, with the victory of the English rulers in the Battle of Plassey. Within 1857, the whole of India went under the British rule. They began modernizing administrative system in India by phases through different reform committees. Initially, the Indians were almost kept off administrative and other jobs. Later, Indians were recruited in government jobs in increased number. By this the British rulers tried to retain their empire by appeasing the native people. The native civil servants mostly worked as the British Imperialists agents. Of course, there were few exceptions. Even, communalism was patronized by them. They were Indians in body but at heart they were British. British rule ended more than half a century ago. But still now, many of our civil servants keep colonial lagacy in mind, which is unfortunate. It can be stated as a success of the imperalist British rulers. This article aims to analyse various reforms of the Indian Civil Service introduced by the British rulers from 1780 to 1930 and their impact on the society and politics of India.

ভূমিকা

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের সূচনা হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে "এটা (পলাশীর যুদ্ধ) বাংলায় এবং প্রকৃত পক্ষে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা করে"। ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার মাধ্যমে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যবর্তী (১৭৫৭-১৮৫৭) একশ' বছর ভারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা শাসিত হয়। ১৮৫৮ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণা বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্থলে নিজেই ভারত শাসনভার গ্রহণ করেন। অতএব দেখা যায় যদিও পলাশীর যুদ্ধে মাত্র পাঁচশতের মতো লোক হতাহত হয়, অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতিও তেমন বেশী হয়নি- এর মাধ্যমে সমগ্র ভারতের ইতিহাসের

সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি।

গতিপথ দিক পরিবর্তন করে। একমাত্র ব্রিটিশ শাসকরাই সমগ্র ভারতকে অভিন্ন শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনতে সক্ষম হন। এর পূর্বে অখন্ড ভারত শুধু কবির কল্পনা এবং কিংবদন্তীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

ব্রিটিশ শাসন ও আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা

ইউরোপে যখন আধুনিকতার জয় জয়কার, ভারত তখনো মধ্যযুগীয় অন্ধকার, ক্ষেত্রবিশেষে প্রাচীন যুগের কুসংস্কারে নিমজ্জিত। নিজেদের সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে ভারতীয়রা ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা তথা আধুনিকতার আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ায় সুযোগ পায়। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মতো আধুনিকমনস্ক মহাপুরুষ অংশতঃ ব্রিটিশ শাসন এবং এ থেকে সৃষ্ট আধুনিকতারই ফসল। তবে সেজন্য ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, নির্যাতন সর্বোপরি নির্বিচার লুণ্ঠনকে কখোনোই খাটো করে দেখা যাবে না। তবে এ সময় বিশেষ করে শিক্ষা এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। প্রাক-ব্রিটিশ যুগের ভারতে প্রশাসন ব্যবস্থা মোটেই সংগঠিত ছিলোনা। কর্মচারিদের চাকুরীর স্থায়িত্ব শাসকের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জায়গীর দেয়া হতো। কখনো কখনো নগদ অর্থেও বেতন দেয়া হতো। নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিবর্তে দেখা হতো বংশ পরিচয়। ভারতে সুশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা এবং মেধা ভিত্তিক নিয়োগ ব্রিটিশ শাসনেরই অবদান। তবে তাঁরা ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ততটুকু আধুনিকায়নই অনুমোদন করেছে যতটুকু তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে ছিলো। একথা প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯৬০ সালকে ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের সূচনাকাল বলে ধরা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি এবং ভারত থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের বিপুল যোগান শিল্প বিপ্লবকে তরান্বিত করে। এ থেকে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের লুণ্ঠনের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য ছিলো শোষণ ও লুণ্ঠনের এ প্রক্রিয়াকে নিষ্কন্টক রাখা। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রাপ্ত অন্যান্য শুভ-অশুভ সব ফলাফলই মূলতঃ এ লক্ষ্যেরই উপজাত- এ কথা নিসংশয়ে বলা যায়। তবে নবাবী আমলের অসংগঠিত, বিশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থার তুলনায় ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা অনেক সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিলো।

প্রধান প্রধান সংস্কারসমূহ

প্রায় দু'শ বছরের শাসনে ভারতীয় প্রশাসনে যতো সংস্কার ও আধুনিকায়ন হয়েছে পূর্ববর্তী এক হাজার বছরেও তা হয়নি। এ সময় পুরনো কাঠামোকে যে সম্পূর্ণ

নাকচ করা হয়েছে তা বলা যাবে না। অনেক বিষয় যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি জেলা, মহকুমা, থানা হাকিমসহ পূর্ববর্তী আমলের অনেক শব্দই ব্রিটিশ শাসকেরা অক্ষুন্ন রাখে। সম্রাট শেরশাহ এবং মহান মুঘল সম্রাট আকবরের কাছে অনেক ব্রিটিশ লেখকও ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন।

লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩) এর সংস্কার

লর্ড কর্নওয়ালিসের সর্বপ্রধান পরিচয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক হিসেবে। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তিনি কিছু সংস্কার সাধন করেন। কর্নওয়ালিস ১৭৯০ সালে তৎকালীন বাংলার নামসর্বস্ব নবাবের ফৌজদারী বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার অবসান করে কলকাতায় সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। তেইশটি জেলায় কালেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হয়। কালেক্টরদের রাজস্ব সংক্রান্ত বিচার ক্ষমতা বাতিল করে দেওয়ানী বিচারকের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্যপদ্ধতির জন্য তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এর ঐতিহ্য স্থাপন করেন। কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কিছু নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেন। এগুলো সিভিল সার্ভিস কোড নামে পরিচিত। 'জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায়' বিশ্বাসী কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের পরিবর্তে কেবল মাত্র ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগের নীতি গ্রহণ করেন। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে কর্নওয়ালিস আশা করেছিলেন যে এর ফলে তাদের সততা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক (১৮২৮-৩৫) এর সংস্কার

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের শাসনামল নানা দিক দিয়ে স্মরণীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অনগ্রসর ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এরূপ বিশ্বাস থেকেই তিনি নানা ধরনের সংস্কারের ব্রতী হন। তাঁর সবচেয়ে মহান কীর্তি সতীদাহ প্রথার মতো বর্বর কুপ্রথার বিলোপ সাধন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাঁর সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ভ্রাম্যমাণ আদালত ও প্রাদেশিক আপিল আদালতগুলি বেন্টিংক বাতিল করেন। ফৌজদারী মামলার দায়িত্ব জেলার বিচারকদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কয়েকটি জেলা নিয়ে একেকটি ডিভিশন বা বিভাগ গঠিত হয়। প্রতিটি ডিভিশনের জন্য কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জজ ও পুলিশের

কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। বেন্টিংক গুণানুযায়ী ভারতীয়দের সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ভারতীয়দের মধ্য থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগের রীতি চালু করা হয়। আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। বেন্টিংক লর্ড মেকলের সভাপতিত্বে একটি আইন-কমিশন গঠন করেন। মেকলের প্রচেষ্টায় বিখ্যাত 'ভারতীয় পেনাল' কোড রচিত হয়।

১৮৩৩ সালে প্রণীত হয় সনদ আইন। এ আইনে বলা হয় "ধর্ম, জন্মস্থান, বংশ, বর্ণ প্রভৃতির জন্য ব্রিটিশ ভারতের কোন ব্যক্তি ও ভারতে বসবাসরত ব্রিটিশ রাজ্যের কোন প্রজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কোন কর্ম বা চাকুরী ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষিত হবেন না।"

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কোম্পানীর শাসনের অবসান

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতব্যাপী এক মহাবিদ্রোহ দেখা দেয়। এ স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এবং তাঁদের কতিপয় এদেশীয় দোসর 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করে এর গুরুত্বকে খাটো করতে চান। সংগ্রামীরা প্রায় এক বছর পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকদের ব্যতিব্যস্ত রাখলেও প্রধানত অনুন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং দেশীয় কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহ অবসানের পর ১৮৫৮ সালের ২রা আগষ্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে ভারত শাসনভার ন্যস্ত করে। ব্রিটিশ কেবিনেট মন্ত্রীদের মধ্য হতে একজনকে ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারতের শাসন কার্য পরিচালনা করবেন বলে স্থির হয়। ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। এ সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ঘোষণায় বলেন " জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকল প্রজা তাঁদের শিক্ষা, সামর্থ্য ও ক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্ম ব্যবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নিযুক্ত হবেন"।

ইতোপূর্বে ১৮৫৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক করা হয়েছিলো। ১৮৬১ সালের কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে শ্রেণীকরণ নীতি ত্যাগ করা হয় এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই কাউন্সিলেকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। নতুন কাউন্সিল আইন অনুসারে ভারতের নতুন আইন সভা গঠিত হয়।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তকরণের দাবী

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পর ভারতীয়দের মনে সিভিল সার্ভিসে স্থান লাভের উচ্চাশা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি এবং ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তেমন চেষ্টাও করা হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে ভারতীয়দের দাবী সুস্পষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়। এ দাবীর দু'টো লক্ষ্য ছিলো ঃ (ক) ব্রিটিশ ভারতে একই সাথে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং (খ) বয়ঃসীমা বৃদ্ধি। এ দাবী ভারত ও ব্রিটেন উভয় দেশেই জোরালোভাবে উত্থাপিত হতে থাকে। অনেক ব্রিটিশ লেখকও ব্রিটিনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এলফিনষ্টোন বলেন যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রাখার নীতি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে।

এ প্রসংগে লর্ড মেকলে বলেছিলেন,"এ মুহূর্তে এমন এক শ্রেণী সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে শ্রেণী আমাদের ও লক্ষ লক্ষ শাসিতের মধ্যে ব্যাখ্যাকারীর ভূমিকা পালন করবে। এ শ্রেণী এমন এক শ্রেণী হবে যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্ত রুচি, অভিমত, নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ"। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীন বাংলাদেশের অনেক সরকারি চাকুরেই মেকলে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তরে লালন করেন। ব্রিটিশ শোষণে অতীষ্ঠ জনগণের ক্ষোভকে কিছু চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হতে না দেয়ার প্রয়াস থেকেও সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের উদ্যোগের দাবী উচ্চারিত হতে থাকে। অবশ্য সব ইংরেজই উল্লিখিত ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ভালো ইংরেজ এবং খারাপ ইংরেজের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। কোন কোন ইংরেজ ভারতবাসীদের কল্যাণ কামনা থেকেও সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণকে সমর্থন করেছিলেন।

সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস

ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিস ভারতীয়করণের দাবীর মুখে ১৮৭০ সালে একটি আইন প্রণীত হয়। এ আইনে বলা হয় যে, ভারতের কর্ম ব্যবস্থায় সপরিষদ ভারত সচিবের মঞ্জুরীর ভিত্তিতে সপরিষদ গভর্নর জেনারেল কর্তৃক স্বীকৃত নিয়ম- পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয়দের নিয়োগদান করা হবে। এ আইনে যে নিয়ম-পদ্ধতি স্থির করা হয় তাকে কেন্দ্র করে, ভারত সরকার ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ফলে এ আইনকে কার্যকরী করতে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

এ আইনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের এক ষষ্ঠংশ পদ ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। স্থানীয় প্রশাসন এসব ভারতীয় প্রার্থীকে মনোনীত করতেন। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনক্রমে ভারত সচিব কর্তৃক এরা নিয়োগ পেতেন। এ আইনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ সংবিধিবদ্ধ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নামে পরিচিত হতেন। ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত এ আইনের অধীনে মোট ৪৮ জন ভারতীয় নিয়োগ লাভ করেন।

সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ এ সার্ভিসের জন্য মনোনীত কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট পদের জন্য মনোনীত করা হতো। তাঁরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য বলে গণ্য হতেন না । তাঁরা সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের চেয়ে কম বেতন পেতেন এবং পদমর্যাদায়ও সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের চেয়ে নীচে ছিলেন। নিয়োগদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির প্রচুর অভিযোগে ছিলো। মেধার বদলে বংশগত আভিজাত্য যোগ্যতার মাপকাঠি হওয়ায় তা সমালোচিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের পরিবর্তে মনোনয়নের পদ্ধতিকে অনেকেই অসম্মানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এটা ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমনেও ব্যর্থ হয়।

এচিসন কমিশন (১৮৮৬-৮৭)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের অর্ন্তভুক্ত করার দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কংগ্রেস ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় চাকুরীতে নিয়োগের জন্য সচেষ্ট হয়। অবশ্য প্রথমদিকে কংগ্রেসের কর্মকান্ড প্রধানতঃ সংক্রান্ত দাবী দাওয়া উত্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আমলা এলান অক্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের পক্ষে তখন স্বাধীনতা কিংবা স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করা ছিলো অচিন্ত্যনীয়। হিউম কংগ্রেসকে ব্রিটিশ সরকারের 'সেফটি ভাল্ব' অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক কাজের প্রতিরোধক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রার্থীদের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি দাবী করে। কংগ্রেস সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা একই সংগে ভারত ও ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠান, এবং প্রার্থীদের বয়স ২৩ বছরে উন্নীত করার সুপারিশ করেন। এ সকল দাবীর

পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৬ সালে পাঞ্জাবের গভর্নর লর্ড এচিসনের সভাপতিত্বে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। এটি 'এচিসন কমিশন' নামে পরিচিত। কমিশনের লক্ষ্য ছিলো এমন ব্যবস্থ্ব উদ্ভাবন করা যা প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবীর প্রতি পূর্ণ সুবিচার করতে পারে ও কর্মব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।

এচিসন কমিশন যুগপৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দাবী নাকচ করে। কারণ কমিশনের মতে প্রথমতঃ এ পরীক্ষায় ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান পরিমাপ করা হবে। ইংল্যান্ড ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের কেন্দ্র ভূমি। তাই ইংল্যান্ডেই এ পরীক্ষা হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ ভারতের মাটিতে পরীক্ষা হলে বহু সংখ্যক প্রার্থী অংশগ্রহণ করবে এবং অল্প সংখ্যক প্রাথী উত্তীর্ণ হবে। বিপুল সংখ্যক প্রার্থী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সৃষ্টি করবে । তৃতীয়তঃ এতে প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা সংরক্ষিত নাও থাকতে পারে।

কমিশন প্রার্থীদের বয়ঃসীমা বৃদ্ধির দাবী সমর্থন করে। কমিশনের মতে ভারতীয় যুবকেরা অল্প বয়সে পরীক্ষায় সফলতার উপযোগী শিক্ষা লাভে সক্ষম হতো না । কমিশন প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স ২৩ বছর ও সর্বনিম্ন বয়স ১৯ বছর ধার্য করার সুপারিশ করে।

ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবী কমিশন প্রত্যাখান করে। পূর্বে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরবী ও সংস্কৃতে নির্দিষ্ট ছিলো ৫০০ নম্বর, কিন্তু ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় যথাক্রমে ৮০০ ও ৬৬০ নম্বর ছিলো। কমিশন আরবী ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এগুলোকে ল্যাটিন ভাষার সমান মর্যাদা প্রদানের সুপারিশ করে।

কমিশনের মতে, সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে মনোনয়নের ফলে তোষণনীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অযোগ্য সন্তানেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকুরী পেয়েছেন। পদমর্যাদা নিম্ন হওয়ায় এর আবেদনও হ্রাস পেয়েছে। অতএব কমিশন এর বিলুপ্তির সুপারিশ করে। কমিশন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে 'ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়া' নামকরণের প্রস্তাব করে। এটা গৃহীত হয়নি। বাস্তবে নামকরণ হয় 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'। এছাড়া কমিশন প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মের জন্য 'অধঃস্তন সিভিল সার্ভিস' গঠনের সুপারিশ করে। অধঃস্তন সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারবেন।

প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের শূন্য পদগুলো অংশতঃ পদোন্নতি এবং অংশত নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

এচিসন কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়। সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের অবসান হয় এবং প্রাদেশিক ও অধঃস্তন সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন হয়। প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৩ বছরে উন্নীত হয়। চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের এক ষষ্ঠাংশ পদ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এ পদগুলো 'তালিকাভুক্ত পদ' হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজকীয় (ইসলিংটন) কমিশন, ১৯১২

এচিসন কমিশনের সুপারিশ ভারতীয়দের খুশী করতে ব্যর্থ হয়। ভারতে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের দাবী বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯০২ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রশাসনের ভারতীয়করণের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আগাখান, এম এ জিন্নাহ, স্যার আব্দুর রহিম প্রমুখ মুসলিম নেতা প্রশাসনে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ এবং সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা ইংল্যান্ডের পাশাপাশি ভারতে অনুষ্ঠানের দাবী করেন। প্রশাসনিক জটিলতা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি কারণে প্রশাসন সংস্কার এবং কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এ অবস্থায় ১৯১২ সালে নিউজিল্যান্ডের গভর্নর ইসলিংটনের সভাপতিত্বে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় যার সদস্য সংখ্যা ছিলো ১০ জন। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড এ কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশন তিনটি নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। নীতিগুলো হলোঃ ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উন্নতমান বজায় রাখার নীতি; ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ়করণ; এবং ভারতীয়দের যুক্তিযুক্ত দাবী পূরণ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। কমিশন ১৯১৫ সালে রিপোর্ট প্রণয়ন সমাপ্ত করে এবং তা প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে।

তখনকার প্রচলিত ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ লাভের সুযোগ ছিল না । ১৯১৫ সালে ১২৫০ জন সিভিল সার্ভেন্টের মধ্যে ৬৩ জন অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৫ জন ছিলেন ভারতীয়। কমিশন শতকরা ৭৫ জনকে ব্রিটেনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং শতকরা ২৫ জনকে

মনোনয়নের মাধ্যমে ভারত থেকে নিয়োগ করার সুপারিশ করে। এ ছাড়া ভারতীয়রা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে পারবেন। এভাবে সিভিল সার্ভিসের ১৮৯ জন কর্মকর্তা ভারতীয়দের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। জেলা ও সেশন জজ আদালতের ৪০টি পদ ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত হয়। আর উচ্চতর প্রশাসনিক পর্যায়ে ৪১টি পদ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে পূরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত ভারতীয়দের ইংল্যান্ডে তিন বছর প্রশিক্ষণ লাভ করতে হয়।

সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশের পাশাপাশি বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৩ বছর থেকে ১৯ বছর-এ নামিয়ে আনার সুপারিশ করে। কমিশনের যুক্তি ছিলঃ প্রথমতঃ সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৩ বছর হলে প্রশিক্ষণের পর ২৫ বছরের আগে তারা কর্ম ব্যবস্থায় যোগ দিতে পারবে না। ফলে তাদের মানসিক প্রকৃতিকে ঢেলে সাজানো সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়তঃ ঐ বয়সে কর্মকর্তারা সংসারী হলে তাদের দক্ষতার মান ক্ষুন্ন হতে পারে। তৃতীয়তঃ এর ফলে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময়সীমা কমে যাবে। কার্যতঃ ভারতীয়দের শিক্ষা জীবন শেষ করতে তুলনামূলকভাবে বয়স বেশী হয়ে যেতো। ফলে ভারতীয়দের পক্ষে এত অল্প বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ ও উত্তীর্ণ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তাছাড়া সুশাসনের জন্য সব সম্প্রদায় থেকে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব শাসন ব্যবস্থায় থাকা প্রয়োজন। ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার একইভাবে হয়নি। ফলে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা হলে অসাম্য আরও বাড়বে। তাই কমিশন ভারতীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগের ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রথার সুপারিশ করে। এক হিসেবে দেখা যায় ১৯১৩ সালে মুসলমানগণ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ২২ জন হলেও চাকুরী ক্ষেত্রে শতকরা ১৭ ভাগ পদের অধিকারী হয়েছে। মনোনয়ন প্রথার দুর্নীতি সম্পর্কে কমিশন সজাগ ছিলেন। কমিশন মনোনয়ন কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রার্থীদের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

ইসলিংটন কমিশন সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। তবে ভারতীয়দের চেয়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ভারতে চাকুরী করতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিলো এ বৈষম্যের কারণ- বর্ণ বৈষম্য নয়।

কমিশন বিভিন্ন যুক্তিতে যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণে দাবী নাকচ করে। প্রথমতঃ ব্রিটেন ও ভারতে যুগপৎ পরীক্ষা হলে প্রশাসনে অদক্ষ ও অশিক্ষিত লোকের প্রবেশ ঘটবে এবং প্রশাসন ব্যবস্থার মান অবনত হবে। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কিছু কিছু বিষয় সংযোজিত হওয়ার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার গতি ব্যাহত হবে এবং আঞ্চলিক ভাষার গুরুত হ্রাস পাবে। তৃতীয়তঃ যুগপৎ পরীক্ষার ফলে সমমান রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

ভারতীয় কর্ম ব্যবস্থাকে স্তরভিত্তিক ও আনুভূমিক-এ দুপর্যায়ে বিভক্ত করার জন্য ইসলিংটন কমিশন কর্মব্যবস্থাকে কাজের ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণী-এ চার ভাগে বিভক্ত করে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দৈহিক কর্মে, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর করণিক এবং দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত থাকবেন। নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তারা উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তাদের অনুরূপ সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন। আনুভূমিক ভিত্তিতে ভারতীয় কর্ম ব্যবস্থাকে রাজকীয় সিভিল সার্ভিস, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস ও অধঃস্তন সিভিল সার্ভিস এ চারভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

কমিশন চাকুরীর শর্তাবলী সহজ করার সুপারিশ করে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের জন্য স্বতন্ত্র ছুটি বিধির সুপারিশ করা হয়। পূর্বে ভারতীয় কর্মকর্তাদের নিজ নিজ পেনশন তহবিলে চাঁদা দিতে হতো; কমিশন তা রহিত করার সুপারিশ করে। পূর্তকর্ম, রেল প্রভৃতি কয়েকটি ব্যতীত অন্যত্র সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ বন্ধ করার সুপারিশ উল্লেখযোগ্য।

বেসামরিক প্রশাসন থেকে সামরিক কর্মকর্তাদের সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা, ভারতীয়দের জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইসলিংটন কমিশনের রিপোর্টে ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা হ্রাস ও যুগপৎ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবী নাকচ ভারতীয়দের ক্ষুদ্ধ করে তোলে। মনোনয়ন পদ্ধতিও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অনেকের মতে এ পদ্ধতি ছিলো অযোগ্য ব্যক্তিদের দাক্ষিণ্য বিতরণ এবং এর মাধ্যমে অনুগ্রহপুষ্ট অনুগত শ্রেণী তৈরী করে ভারতে ব্রিটিশ শাসন আরো দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস। স্যার ভ্যালেন্টাইন মিরোলের মতে ইসলিংটন কমিশনের সুপারিশ ভারতীয়দের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেনি এবং ব্রিটিশ কর্তকর্তাদের মনোভাবেও কোন পরিবর্তনের সূচনা করেনি।

ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার (মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড) রিপোর্ট ১৯১৯

ইসলিংটন কমিশনের সুপারিশ ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি বরং উত্তেজিত করেছিলো মাত্র। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের সহযোগিতা ব্রিটিশ শাসকদের ভারতে উদারনীতির সূচনায় অনুপ্রাণিত করে। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু কমন্সসভায় ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অধিক হারে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ এবং ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করে। ভারত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষণায় একথাও বলা হয়।

উক্ত ঘোষণার আলোকে কমিশন ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গড়তে প্রশাসনে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ করার সুপারিশ করে। এর মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব কমে আসবে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশন সুপারিশ করে যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের শতকরা ৩৩ ভাগ কর্মকর্তা ভারত থেকে নিয়োগ লাভ করবেন। পরবর্তী কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত আরো শতকরা ১.৫ ভাগ পদে ভারতীয়রা নিযুক্ত হবেন। তবে এ ভারতীয়করণ নিঃশর্ত ছিলো না। নবাগত কর্মকর্তারা যাতে প্রশাসনের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখার কথা বলা হয়। একই চাকুরীর বিভিন্ন গ্রেডে ভারতীয় ও ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বন্টন সুষম হতে হবে। প্রাদেশিক বিভিন্নতা বজায় রেখে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ভারতীয়দের নিয়োগের হার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে হবে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বৃদ্ধি না করার সুপারিশ করা হয়। অর্থাৎ ভারতীয়করণ অবাধ ছিলো না। কমিশন প্রকৃতপক্ষে ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বজায় রেখে এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের প্রভাব অক্ষুন্ন রেখে তারপর অধিকসংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগের পক্ষপাতি ছিলো।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশন প্রশাসনে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, একই সংগে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখার সুপারিশ করে। ভারতে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে যাতে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা হতাশ হয়ে অধিক সংখ্যায় চাকুরী ছেড়ে না দেন সেজন্য কমিশন তাদের বেতন, ছুটি, পেনশন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। ১৯১৯ সালে ভারত সচিবের ক্ষমতা হ্রাস এবং মন্ত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রদেশগুলোতে নির্বাচিত সরকার গঠন করা হয়। এ পরিস্থিতি অসহনীয় মনে হওয়ায় অনেক ব্রিটিশ কর্মকর্তা চাকুরী ছেড়ে অবসর নেন।

পূর্বে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই নীতি নির্ধারণ করতেন। কিন্তু ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে এ ভূমিকার পরিবর্তন হয়। এ রিপোর্টে আশা করা হয় যে, এখন থেকে উচ্চতর পর্যায়ের কর্মকর্তারা মন্ত্রীদের উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করবেন ও নীতি নির্ধারণে নিরপেক্ষভাবে মন্ত্রীদের সহায়তা করবেন। তাঁরা সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে মন্ত্রীদের সহায়তা করবেন এবং নির্ধারিত নীতি নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়ন করবেন। ভারতের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ ও অগ্রগতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্যও তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতা, শুভেচ্ছা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ধারণ করার জন্য ভারতীয় রাজনীতিবিদদের পরামর্শ দেয়া হয়।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও ভারতীয় মন্ত্রীদের আংশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রিপোর্টে ভারতীয় মন্ত্রীদের আংশিক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যাতে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন সেজন্য তাঁদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সংগঠনে বৃটিশ কর্মকর্তাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁরা যাতে ব্যাপক সংখ্যায় দেশ ত্যাগ না করেন সেজন্য তাঁদের অধিকার সংরক্ষিত থাকতে হবে। ফলে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার আওতায় আনা হয়।

ভারতে আংশিক স্বায়ত্বশাসন মঞ্জুর এবং ভারতীয় মন্ত্রীদের কিছুটা নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদানের ফলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পায়। শাসকের ভূমিকা থেকে কর্মকর্তার ভূমিকায় পরিবর্তনে অনেক কর্মকর্তাই অস্বস্তিবোধ করেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, একদিন তাঁদের ভারত ছেড়ে যেতেই হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে বেতন ভাতার সামঞ্জস্য বিধান না করায়ও ব্রিটিশদের চাকুরীর মোহ কমে যায়। ফলে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় চাকুরী ছেড়ে স্বদেশ পাড়ি দেন। এদের সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিলো ২০০ জন এবং ১৯২৪ সালে এই সংখ্যা ৩৪৪-এ উন্নীত হয়। ফলে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯২২ সালে ভারত ও ব্রিটেনে পরীক্ষার দাবী স্বীকৃত হয়। ১৯২৫ সালে ভারতীয় প্রার্থীর সংখ্যা ছিলো ৬২ জন। ১৯৩৪ সালে তা ২৬২ জনে উন্নীত হয়। ইউরোপীয় প্রার্থীর সংখ্যা ১৯২৫ সালে ছিলো ৭১ জন, ১৯২৮ সালে ১২১ জন এবং ১৯৩৫ সালে ৭১ জন। সামগ্রিকভাবে তখনো ভারতীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। ১৯২৪ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ সদস্য ছিলেন ভারতীয়।

ভারতের উচ্চতর কর্মব্যবস্থা রাজকীয় লী কমিশন (১৯২৩)

মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশনের রিপোর্ট ভারতবাসীকে একদিকে আশান্বিত করে, অন্যদিকে, অনেকের মতে ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে প্রাপ্তি ছিলো সামান্য। নতুন নীতির বাস্তবায়ন ছিলো মন্থর। যুদ্ধোত্তর মূল্যস্ফীতিও চাকুরী ব্যবস্থার সংস্কারে পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা রাখে। এ অবস্থায় ১৯২৩ সালে ফেয়ারহামের লর্ড লী-কে সভাপতি করে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়।

লী কমিশন ভারতের কর্মব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। যথা (১) সংরক্ষিত বিষয়ে কর্মরত প্রশাসনিক বিভাগ, (২) হস্তান্তরিত বিষয়ে কর্মরত প্রশাসনিক বিভাগ, (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কর্মরত প্রশাসনিক বিভাগ। সংরক্ষিত বিষয়ে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল ভারত সচিবের উপর । হস্তান্তরিত বিষয়ে নিয়োগের ক্ষমতা ছিলো প্রাদেশিক সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে প্রশাসনিক বিভাগসমূহে তিন ভাবে নিয়োগ হতো। ভারত সচিব কর্তৃক সরাসরি, ভারত সরকার কর্তৃক এবং আংশিকভাবে ভারত সচিব ও ভারত সরকার কর্তৃক। লী কমিশন প্রশাসনে দ্রুতহারে ভারতীয়দের নিয়োগের সুপারিশ করে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের শতকরা বিশ ভাগ পদ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের সুপারিশ করা হয়। আর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ প্রাপ্তদের অর্ধেক হবেন ভারতীয় ও অবশিষ্টাংশ ইউরোপীয়।

কমিশন কর্মকর্তাদের চাকুরীর শর্তাবলী উদারীকরণের সুপারিশ করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। লী কমিশন ভারতীয় সিভিল, বন, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ লাভ এবং ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে অনেক ইংরেজ চাকুরীর প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কমিশন সিভিল সার্ভিসের ইউরোপীয় সদস্যদের জন্য বৈদেশিক ভাতা, পরিবারের সদস্যদের জন্য ভ্রমণ ভাতা, অর্জিত অর্থ ব্রিটেনে প্রেরণের সুবিধা প্রভৃতির সুপারিশ করে। এ ছাড়া কমিশন বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য উদার পেনশন ও বিশেষ চিকিৎসা সুবিধার সুপারিশ করে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হলেও দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে কমিশনের রূপরেখা নির্ধারিত হয়নি। যদিও ভারত সচিব ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা চলছিলো। প্রশাসনকে দক্ষ ও প্রভাবমুক্ত রাখতে হলে একটি শক্তিশালী পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রয়োজন। এ কারণে লী কমিশন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত একটি শক্তিশালী পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত এ কমিশনের ব্যক্তিবর্গের পদমর্যাদা ও

পারিশ্রমিক হাই কোর্টের বিচারপতির সমান। এর মৌল দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাছাইয়ের মান নির্ধারণ, প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ এবং তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।

লী কমিশনের সুপারিশের পর ভারতের সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের পথ প্রশস্ত হয়। তবে এই সুপারিশ তখন কোন পক্ষকেই খুশী করতে পারেনি। ভারতীয়করণের সুপারিশ ইউরোপীয়দের অসন্তুষ্ট করেছে। বর্ধিত আর্থিক সুবিধাদিও অসন্তোষকে দূর করতে পারেনি। এ বর্ধিত সুবিধা ভারতীয়দের ক্ষুব্ধ করেছে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৬ সালে ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়। হস্তান্তরিত বিষয়ে সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে নিয়োগ বন্ধ হয় ১৯২৪ সালে। ভারত সচিব শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিস, বন সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের সেচ শাখা ও বন সার্ভিসের কর্মকর্তা নিয়োগ অব্যাহত রাখেন। আর্থিক সুযোগ সুবিধা অপর্যাপ্ত মনে হওয়ায় এবং ১৯২২ সালে যুগপৎ পরীক্ষা শুরু হওয়ায় ইউরোপীয় প্রার্থীর সংখ্যা হ্রাস ও ভারতীয় প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা হ্রাসের ফলে ভারত সচিব মনোনয়নের মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগ শুরু করেন, যদিও এটা সমালোচিত হয়। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এ প্রথা চালু থাকে।

ভারতীয় সংবিধিবদ্ধ (সাইমন) কমিশন ১৯৩০

লী কমিশনের অনেক সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার পরও ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম হয়। এসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালে জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন ভারতে কর্মরত পাঁচটি কর্মব্যবস্থার কার্যাবলীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের নিয়োগ ও পরিচালনার দায়িত্ব ভারত সচিবের উপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করে। এদু'টি সার্ভিসের নিয়োগ হবে সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে।

সাইমন কমিশন লী কমিশনের অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের সুপারিশকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করে। কমিশন নতুন যুক্তির অবতারণা করে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রাধান্য বজায় রাখার সুপারিশ করে। এর পক্ষে যুক্তি ছিলো দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ভারতে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ কর্মকর্তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হচ্ছে এবং ভারতীয় কর্মকর্তারা অনেকেই সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ছেন। এ অবস্থায় সততা, নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের প্রাধান্য অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ ভারতে নব প্রতিষ্ঠিত দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং গণতন্ত্রকে দৃঢ়মূল করতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের

সেবা অপরিহার্য। শিক্ষিত ভারতীয় মহলে যুক্তি দু'টো তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ব্রিটিশ শাসকদের 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' নীতিরই ফলশ্রুতি। অন্য দিকে ভারতীয় মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করতে নারাজ বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ কর্মকর্তার ভারত ত্যাগ গণতন্ত্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার প্রমাণ দেয় না।

কমিশন ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বিশেষ সুবিধা দান ও ভারতে পূর্ণ মাত্রায় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে কোন কর্মকর্তা ভারত ছেড়ে চলে যেতে চাইলে তিনি যেন সহজে সকল সুবিধাসহ যেতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের সুপারিশ করে। কমিশনের মতে দক্ষ ও যোগ্য ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সকল সুযোগ সুবিধা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং নবাগতদের জন্যও তা নিশ্চিত করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সকল সুযোগ সুবিধাসহ অবসর গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। কমিশন প্রদেশগুলোতে প্রয়োজনবোধে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করে। প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষে যুক্তি হলো প্রথমতঃ প্রাদেশিক সার্ভিসের কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ; দ্বিতীয়তঃ নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে মন্ত্রীদের অব্যাহতি; এবং তৃতীয়তঃ স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান। কমিশনের মতে এ পদক্ষেপের ফলে শাসন বিভাগ সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবে। ব্যয় সংকোচনের জন্য একাধিক ক্ষুদ্র প্রদেশ মিলে একটি প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ প্রশাসন তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ভারত শাসন করে। এগুলো ছিলো রাজস্ব সংগ্রহ (সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচার), আইন- শৃঙ্খলা রক্ষা (স্বাধীনতার স্পৃহাকে যে কোন মূল্যে দমন) এবং প্রতিরক্ষা (অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ভারতকে নিজ দখলে রাখা)। এসব বাস্তবায়নের জন্য দমন লুণ্ঠনের পাশাপাশি ভেদনীতি অর্থাৎ হিন্দু- মুসলমানকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানোর মতো জঘন্য কৌশলও তারা অবলম্বন করে। দিন বদলের সংগে সংগে ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হতে থাকে। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান হারে প্রশাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের নিয়োগের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ প্রশমিত করে স্বাধীনতার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রয়াস চালানো হয়। দ্বিতীয়তঃ অবাধ্য ভারতীয়দের দমনের জন্য কিছু ভারতীয়ের প্রয়োজন ছিলো। কারণ ভারতের নাড়ী নক্ষত্রের খবর এসব ভারতীয়ের বেশী জানা ছিলো। আন্দোলন, সংগ্রাম দমনে কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজদের চেয়ে ভারতীয়রা অধিকতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ দমনে পাঞ্জাবী সৈন্যদের ভূমিকা এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায়।

পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ব্রিটিশ আমলে আন্দোলন দমনে যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভারতে লর্ড মেকলের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী (সিভিল সার্ভিসের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা) মনস্তাত্তিকভাবে ইংরেজ তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়। এসব ভারতীয় কর্মকর্তা ইংরেজদের অনুকরণে নিজেদের ভারতীয়দের প্রভু হিসেবে ভাবতে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তারা জনরোষের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের হাতিয়ারে পরিণত হন। এহেন স্বজাতি বিদ্বেষী মানসিকতা দূর করতে কোন সংস্কার কমিশনই আগ্রহী ছিলো না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা এবং সে অনুযায়ী প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সংস্কারই ছিলো এসব কমিশনের লক্ষ্য । উপরন্তু বিভিন্ন ভাবে প্রভুসুলভ মানসিকতা লালনে কর্মকর্তাদের উস্কে দেয়া হয়। কারণ ভারতীয় কর্মকর্তারা যথার্থ দেশপ্রেমিক হলে ব্রিটিশ শাসন ১৯০ বছর স্থায়ী হতো না। এর মাঝেও যদিও বেশ কিছু ভারতীয় ব্রিটিশের চাকুরী করেও নানা ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করেন। তবে তাঁরা নেহায়েতই ব্যতিক্রম।

ব্রিটিশ শাসন অবসানের অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় পার হয়েছে, কিন্তু সাবেক ব্রিটিশ ভারতের অংশ বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা এখনো তার ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। বিশেষ করে কর্মকর্তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন এবং প্রভুসুলভ মানসিকতার এখনো অবসান হয়নি। এটাকে ব্রিটিশ শাসকদের কৃতিত্ব বলা যায়। এছাড়া ব্রিটিশ শাসনে উপমহাদেশের যতটুকু আধুনিকায়ন হয়েছে তার আংশিক কৃতিত্ব ব্রিটিশ প্রশাসনের । বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যবস্থার ছায়া বই কিছু নয়। এ ব্যবস্থা ও কাঠামো মধ্যযুগের অসংগঠিত ও বিশৃংখলা অবস্থার চেয়ে উৎকৃষ্টতর হলেও একটি স্বাধীন দেশের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

সহায়ক গ্রন্থ

আহমদ, এমাজউদ্দিন (১৯৮৬)। *বাংলাদেশ লোক প্রশাসন।* ঢাকাঃ গোল্ডেন বুক হাউজ।

ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯৬৯)। *আমাদের মুক্তিসংগ্রাম।* ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

রায়, অতুল চন্দ্র (১৯৮৪)। *ভারতের ইতিহাস* (২য় খন্ড)। কলিকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরী।

Chowdhury, Lutful Hoq (1979). *Social Change and Development Administration in South Asia,* Dhaka. NIPA.

Marx, Karl &Engels, Frederick (1964)- *The First Indian War of Independence.* Moscow: Progress Publishers.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য এবং রপ্তানী নীতি
একটি পর্যালোচনা

খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব

Export Policy and Export Trade of Bangladesh : *A Discussion*

Khondoker Abdul Mottaleb

Abstract : Foreign trade is an important macro economic variable of a country. It is one of the most important indicators of an economy. In order to analyse the trend of an economy it is necessary to analyse the trend of export import- performance of a country. Bangladesh is a developing country and balance of trade may play a vital role in achieving rapid economic development of the country. Unfortunately, this important sector could not contribute properly. The trade balance of the country is unfavourable because in each year Bangladesh has to spend more for importing capital goods and raw materials for capital goods as well as industrial raw materials. Also consumption of petroleum products of the country depends entirely on import. Bangladesh is now trying to boost up her export by providing new policy and various forms of incentives to the private sector exporters. This article is devoted to study the recent performance of export trade (from 1990/91 to 1997/98) of Bangladesh. Sectoral contribution such as jute sector, readymade garments etc in the export trade has also been discussed here. In the last section, recently announced Export Policy (1997-2002) has discussed in details.

১। সূচনা

বাণিজ্যে বসত: লক্ষ্মী: কথাটি সর্বাংশে সত্য হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই কথাটি এখনও সত্য হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কখনও বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে লাভের মুখ দেখেনি। উপরন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য আমদানী নির্ভর হওয়ার কারণে বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩/৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৯১৯ মি: মার্কিন ডলার। এই সময় রপ্তানী আয় ছিল ৩৭২ মি: মার্কিন ডলার। ফলে এসময় বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি গিয়ে দাঁড়ায় ৫৩৭মি: মার্কিন ডলারে (বাংলাদেশ সরকার: ১৯৯৩/৯৪, পৃ: ৪২০)। ১৯৮০/৮১ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় ছিল ২৫৩৩ মি: মার্কিন ডলার। একই সময় রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৭১০ মি: মার্কিন ডলারে। যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি গিয়ে দাঁড়ায় ১৮২৩ মি: ডলারে (বাংলাদেশ

সরকার: ১৯৯৩/৯৪,পৃ:৪২০)। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয় ছিল ৫১৬১ মি: মার্কিন ডলার অপরপক্ষে আমদানী ব্যয় ছিল ৭৫২৪ মি: মার্কিন ডলার। যার ফলে উক্ত বছরে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৬৩ মি: মার্কিন ডলর (বাংলাদেশ ব্যাংক: ১৯৯৯,পৃ:১১৭)। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য নিবন্ধে ১৯৯০/৯১ অর্থবছর হতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম সদস্যদেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ববাজার অর্থনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে উদার বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করছে। এজন্য ইতোমধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা উদারীকরণ এবং টাকাকে চলতি হিসাবে বিনিময়যোগ্য করা হয়েছে। বিনিময় হারকে বাজার হারের অধিক নিকটতর করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পাঁচ বছর মেয়াদী রপ্তানী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেছে। আলোচ্য নিবন্ধে ঘোষিত রপ্তানী উন্নয়ন নীতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্যবাণিজ্য (১৯৯০-১৯৯৮)

১৯৯০/৯১ অর্থবছর হতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্য আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রপ্তানী আয় পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে রপ্তানী আয় ছিল ১৭১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯১/৯২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৬.১ ভাগ বেশী। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানী হতে প্রাপ্ত আয় ছিল ৫১৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের তুলনায় ১৬.৫৮ ভাগ বেশী ছিল। ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানী আয় ছিল ৪৪২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সঙ্গে পণ্য আমদানীর চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় রপ্তানী আয় যেভাবে বেড়েছে আমদানী ব্যয়ও প্রায় সেই হারে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমাগত ভাবে বেড়েছে।

সারণী-১। বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্য আমদানী-রপ্তানী, তাদের প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানী-আমাদী অনুপাত

উপাদানসমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫ *	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
পণ্য আমদানী ব্যয় (মি: মা:ড:)	৩৪৭২	৩৫১৬	৪০৭১	৪১৯১	৫৮৩৪	৬৮৮১	৭১৬২	৭৫২৪
বার্শিক শতকরা পরিবর্তন	....	১.৩	১৫.৮	২.৯	৩৯.২	১৭.৯	৪.১	৫.০৫
জিডিপি শতকরা হার**	১০.২	১১.২	১১.০	১০.১	১৪.৩	১৫.৪	২০.৭	....
পণ্যরপ্তানী আয় (মি:মা:ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	......	১৬.১	১৯.৫	৬.৩	৩৭.১	১১.৮	১৪.০	১৬৫৮
জিডিপির শতকরা হার**	৫.৫	৬.২	৭.০	৭.৩	৮.৯	৮.৮	১২.২	.....
রপ্তানী আমদানী অনুপাত	১:২.০২	১:১.৭৬	১:১.৭১	১:১.৬৫	১:১.৬৮	১:১.৭৭	১:১.৬২	১:১.৪৬
বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্য ভারসাম্য (মি:মা:ড:)	-১৭৫৪	-১৫২২	-১৬৮৮	-১৬৫৭	-২৩৬১	-২৯৯৯	-২৭৩৫	-২৩৬৩

উৎস: বাংলদেশ সরকার, বাংলদেশ অর্থনৈতিক সমিক্ষা১৯৯৮,পৃ:১৩০-১৩১
*বাংলাদেশ ব্যাংক(১৯৯৯), বাষিক রিপোর্ট১৯৯৭-৯৮,পৃ:১৭৭। ** বাংলাদেশ সরকার, ফরেন ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ ১৯৯৪/৯৪ এবং ১৯৯৬/৯৭ হতে সংগৃহীত।

সারণী-১ -এ বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্যবাণিজ্যের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯০/৯১ সালে বৈদেশিক পণ্যবাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১৭৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ১৯৯১/৯২, ১৯৯২/৯৩ অর্থবছরে কিছুটা হ্রাস পেলেও ১৯৯৪/৯৫

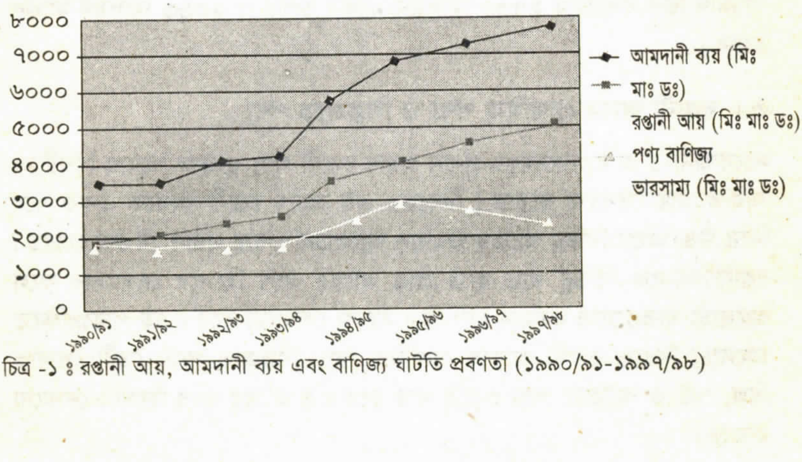

চিত্র -১ ঃ রপ্তানী আয়, আমদানী ব্যয় এবং বাণিজ্য ঘাটতি প্রবণতা (১৯৯০/৯১-১৯৯৭/৯৮)

অর্থবছরে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৩৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে বৈদেশিক পণ্যবাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি ছিল ২৩৬৩ মিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে বাংলাদেশের এই ক্রমাগত ঘাটতির অন্যতম কারণ হলো কিছুকিছু অত্যাবশ্যকীয় পণ্যে বাংলাদেশের পুরোপুরি আমদানী নির্ভরতা। যেমন পেট্রোলিয়ামের সরবরাহ পুরোপুরি আমদানীর উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া উন্নয়ন প্রয়োজনে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানী এবং খাদ্যশস্য আমদানী ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ পণ্য সামগ্রী আমদানী করে। অন্যদিকে বিগত আর্থিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তাণী পণ্য যেমনঃ হিমায়িত খাদ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য ইত্যাদির রপ্তানী আয় হ্রাস পেয়েছে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। যার ফলে আমদানী-রপ্তানী ব্যবধান আশানুরূপ হ্রাস পায়নি। চিত্র-১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় ও রপ্তানী আয়ের প্রবণতা এবং সেই সাথে আমদানী-রপ্তানী ব্যবধান প্রবণতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আমদানী যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, রপ্তানী ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেলেও আমদানীর অনুপাতে বাড়েনি এবং কখনই আমদানী ব্যয়কে রপ্তানী আয় অতিক্রম করতে পারেনি। ১৯৯০/৯১ সালে রপ্তানী-আমদানী অনুপাত ছিল ১:২.০২। ১৯৯৭/৯৮ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১:১.৪৬ ভাগে। বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি ১৯৯০/৯১ হতে ১৯৯৩/৯৪ অর্থবছর পর্যন্ত অনেকটা স্থির থাকলেও ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে তা অনেক বেড়ে যায়। তবে ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছর হতে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতির প্রবণতা নিম্ন গতি রেখার ব্যবধান হ্রাসের ইঙ্গিত করে (চিত্র-১)। ১৯৯৬/৯৭ এবং ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২৩৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩। রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্য

সংযোজনী-১ এ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্য ও উক্ত পণ্যের বিপরীতে অর্জিত আয় দেখানো হয়েছে। নিবন্ধের এই অংশে রপ্তানী আয়কে একক ধরে নিয়ে উক্ত আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। রপ্তানী আয়কে বিভিন্ন খাত হতে প্রাপ্ত আয়ের অংশ হিসেবে দেখানোর ফলে আলোচ্য খাতগুলোর বর্তমান চাল-চিত্র সহজে বোধগম্য হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য নিবন্ধে রপ্তানী আয়কে প্রাথমিক পণ্য, শিল্পজাত পণ্য, তৈরী পোষাক শিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য প্রভৃতি খাত হতে লব্ধ আয়ের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের অবদান আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯০/৯১ অর্থবছর হতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানী বাণিজ্যে প্রাথমিক পণ্যের শেয়ার কখনও শতকরা ১৮ ভাগের বেশী আসেনি। ১৯৯১/৯২ অর্থবছর হতে ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্যের শেয়ার মোটামুটি স্থির ছিল বলা যায়। সারণী-২ এ দেখা যায় যে, ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্যের অবদান ছিল শতকরা ১৩.৪৪ভাগ। ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১১.৮৮ ভাগে। তবে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক পণ্যের অবদান ছিল মাত্র শতকরা ৮.৭০ ভাগ যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৪.৬৪ ভাগ কম।

সারণী-২। রপ্তানী আয়ে প্রাথমিক ও শিল্পজাতপণ্যের অংশ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উপাদানসমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮*
পণ্যরপ্তানী আয় (মি:মা: ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১
প্রাথমিক পণ্য হতে রপ্তানী আয়	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৪৪৯
মোট রপ্তানী আয়ে অংশ (%)	১৭.৮৭	১৩.৪৪	১৩.১৮	১৩.৭০	১৩.০২	১২.২৬	১১.৮৮	৮.৭০
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	--	১২.৭০	১৭.১৬	১০.৫০	৩০.২৬	৫.৩১	১০.৫০	১৪.৬৪
শিল্পজাত পণ্য হতে রপ্তানী আয়	১৪১১	১৭২৬	২০৬৯	২১৮৭	৩০২১	৩৪০৬	৩৯০১	৪৭১২
মোট রপ্তানী আয়ে অংশ (%)	৮২.১৩	৮৬.৫৬	৮৬.৮২	৮৬.৩০	৮৬.৯৮	৮৭.৭৪	৮৮.১২	৯১.৩০
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	--	২২.৩২	১৯.৮৭	৫.৭০	৩৮.১৩	১২.৭৪	১৪.৫৩	২০.৭৯
রপ্তানী আয় (মি:মা: ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১

উৎস: বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮),বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা১৯৯৮,পৃ:১৩০।

*বাংলাদেশ ব্যাংক(১৯৯৯),বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮,পৃ:১১৭।

অন্যদিকে রপ্তানীখাতে শিল্পপজাত দ্রব্যের অংশ ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০/৯১ অর্থ বছরে রপ্তানীখাতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৮২.১৩ ভাগের মত, ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯১.৩০ ভাগে পৌছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছর

১৯৯৬/৯৭এর তুলনায়ন ২০.৭৯ ভাগ বেশী । ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে রপ্তানী আয়ে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৮৮.১২ ভাগ।

৪। রপ্তানী আয়ে পাট ও পাটজাত পণ্য

সারণী-৩ এ পাট ও পাটজাত দ্রব্য হতে রপ্তানী আয় এবং পাট বহির্ভূত খাত হতে রপ্তানী আয় দেখানো হয়েছে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে ৪.৫ লাখ টন পাটজাত দ্রব্য এবং ১৮.১ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে যথাক্রমে ২৭৮.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে ৪.৯ লাখ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে এবং ১৭.৫ লাখ বেল কাঁচাপাট রপ্তানী করে অর্জিত হয় যথাক্রমে ৩১৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমান ৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী একক মূল্য শতকরা ১১.২ ভাগ হ্রাস পাওয়ার কারণে রপ্তানী আয় হ্রাস পেয়েছে (বাংলাদেশ ব্যাংক; ১৯৯৯, পৃ:৬৮)।

সারণী-৩। রপ্তানী আয়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং পাট বহির্ভূত পণ্যের অংশ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উপাদান সমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
পণ্যরপ্তানী আয় (মি:মা:ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১
পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী আয়	৩৯৪	৩৮৬	৩৬৬	৩৪১	৩৯৮	৪২০	৪৩৪	৩৮৯
মোট রপ্তানী আয়েঅংশ (০%)	২২.৯৩	১৯.৩৬	১৫.৩৬	১৩.৪৬	১১.৪৬	১০.৮২	৯.৮০	৭.৫৪
বার্ষিক শতবরা পরিবর্তন	--	-২.০৩	-৫.১৮	-৬.৮৩	১৬.৭২	-৫.৫৩	৩.৩	১০.৩৭
পাট বর্হিভূত পণ্য হতে রপ্তানী আয়	১৩২৪	১৬০৮	২০১৭	২১৯৩	৩০৭৫	৩৪৬২	৩৯৯৩	৪৭৭২
মোট রপ্তানী আয়ে অংশ(০%)	৭৭.০৭	৮০.৬৪	৮৪.৬৪	৮৬.৫৪	৮৮.৫৪	৮৯.১৮	৯০.২০	৯২.৪৬
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	---	২১.৪৫	২৫.৪৩	৮.৭৩	৪০.২২	১২.৫৮	১৫.৩৪	১৯.৫১
রপ্তানীআয় (মি:মা:ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১

উৎস: বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮). বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮,পৃ:১৩০।
বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯),বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮,পৃ:১১৭।

দেশের রপ্তানী আয়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অংশ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে । ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে পাটখাত হতে রপ্তানী আয় বাবদ অর্জিত হয় ৩৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল মোট আয়ের ২২.৯৩ ভাগ। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে এই খাতের অংশ এসে দাঁড়ায় মোট রপ্তানী আয়ের ৭.৫৪ ভাগে (৩৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.৩৭ ভাগ কম। অপরদিকে পাট বহির্ভূত খাতের অবদান দেশের রপ্তানী আয়ে ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানী আয়ে পাট বহির্ভূত খাতের অবদান ছিল ৭৭.০৭ ভাগ। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২.৪৬ ভাগে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯.৫১ ভাগ বেশি। পাট খাতের এই ক্রমহ্রাসমান অবদানের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধান চাষের আধিক্য, বিদেশে পাটের চাহিদা হ্রাস পাওয়া এবং কৃত্রিম তন্তুর সাথে প্রতিযোগিতায় পাটের বিদেশী বাজার হারানো ইত্যাদি। বর্তমানে ধান উৎপাদনের সাথে পাটের সুযোগ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

৫। রপ্তানী আয়ে তৈরী পোশাক শিল্প (নীটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদিসহ)

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরী পোশাক শিল্প খাতে নাটকীয় উন্নয়ন সাধন করেছে। এই শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় খালি হাতেই। ১৯৭৬ সালে শূন্য হাতে শুরু করে বর্তমানে বাংলাদেশ তৈরী পোশাক রপ্তানীর দিক থেকে ১৯৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮ম স্থান, কানাডায় ১৯৯০ সালে ৯ম এবং ১৯৯০ সালে ইইউ ভুক্ত দেশগুলোতে ১০ম বৃহত্তম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে (ইসলাম এবং কুদ্দুস: ১৯৯৬, পৃ:১৬৭)। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় ১০০ রকম তৈরী পোশাক বিশ্বের ৫০টিরও বেশী দেশে রপ্তানী করে থাকে (ইসলাম এবং কুদ্দুস: ১৯৯৬, পৃ:১৬৭)। বর্তমানে তৈরী পোশাক শিল্পখাত হচ্ছে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানী খাত। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে তৈরী পোশাক এবং নীটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি হতে রপ্তানী আয় ছিল ৩৭৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল মোট রপ্তানী আয়ের ৭৩.৩২ শতাংশ (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য) এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৬.০৯ ভাগ বেশী। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে এই খাত হতে অর্জিত হয় ৩,০০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৭.৮২ ভাগ বেশী। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭/৯৮ সালে এই খাত হতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৪৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর বাস্তবে অর্জিত হয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৮.৬ ভাগ বেশী (বাংলাদেশ ব্যাংক: ১৯৯৯, পৃ:১১৭)।

সারণী-৪ । রপ্তানী আয়ে তৈরী পোশাক শিল্প এবং তৈরী পোশাক শিল্প বহির্ভূত পণ্যের অংশ

(মিলিয়ন মার্কিন ডালার)

উপাদানসমুহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
পণ্যরপ্তানী আয় (মি:মা:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১
তৈরী পেশাক শিল্প হতে রপ্তানী আয়	৮৬৭	১১৮৩	১৪৪৫	১৫৫৬	২২২৮	২৫৪৭	৩০০১	৩৭৮৪
রপ্তানী আয়ে অংশ %	৫০.৪৭	৫৯.৩৩	৬০.৬৪	৬১.৪০	৬৪.১৫	৬৫.৬১	৬৭.৭৯	৭৩.৩২
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	--	+৩৬.৪৫	+২২.১৫	+৭.৬৮	+৪৩.১৯	+১৪.৩২	+১৭.৮২	+২৬.০৯
তৈরী পোশাক শিল্প বহির্ভূত হতে রপ্তানী আয়	৮৫১	৮১১	৯৩৫	৯৭৮	১২৪৫	১৩৩৫	১৪২৬	১৩৭৭
মোট রপ্তানী আয়ে অংশ (%)	৪৯.৫৩	৪০.৬৭	৩৯.৩৬	৩৮.৬০	৩৫.৮৫	৩৪.৩৯	৩২.২১	২৬.৬৮
বার্ষিক শতকর পরিবর্তন	--	-৪.৭০	+১৫.৬৬	+৪.২৬	+২৭.৩০	+৭.২৩	+৬.৮২	-৩.৪৪
রপ্তানীআয় (মি:মা:ড:)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১

উৎস: বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮, পৃ: ১৩০।
*বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯), বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮, পৃ: ১১৭।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত তৈরী পোশাকের গুণগতমানের উৎকর্ষ সম্পর্কে আমদানীকারকদের আস্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ফলে উক্ত বছরে এ খাতে রপ্তানী বিপুল হারে বেড়ে যায়। সারণী-৪ এ ১৯৯০/৯১ অর্থ বছর হতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছর পর্যন্ত তৈরী পোশাক শিল্প ও তৈরী পোশাক শিল্প বহির্ভূত খাত হতে রপ্তানী আয় দেখানো হয়েছে। এছাড়া মোট রপ্তানী আয়ে উক্ত খাতগুলির অংশ এবং আয়ের বার্ষিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। সারণী-৪ এ দেখা যায় যে, ১৯৯০/৯১ সালে তৈরী পোশাক রপ্তানী হতে আয় হয়েছিল ৮৬৭ মিলিয়ন ডলার যা ছিল মোট রপ্তানী আয়ের ৫০.৪৭ ভাগ। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে উক্তখাতের অবদান এসে দাঁড়ায় মোট রপ্তানী আয়ের ৭৩.৩২ ভাগে (৩৭৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

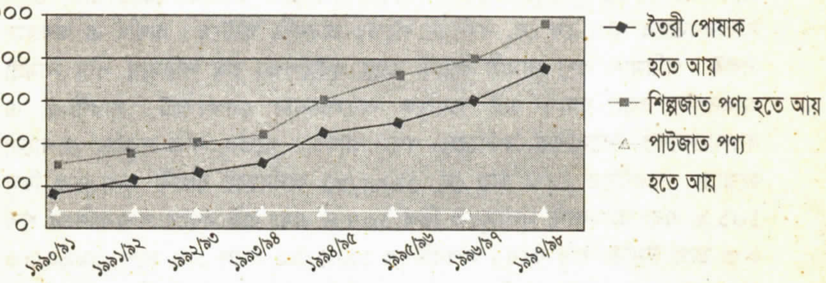

চিত্র -১ ঃ রপ্তানী আয়, আমদানী ব্যয় এবং বাণিজ্য ঘাটতি প্রবণতা (১৯৯০/৯১-১৯৯৭/৯৮)

চিত্র-২ এ, তৈরী পোশাক শিল্প, পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং শিল্পজাত পণ্য হতে রপ্তানী আয়ের প্রবণতা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, তৈরী পোষাক শিল্পখাত হতে অর্জন এবং শিল্পখাত হতে অর্জন ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে পাটখাত হতে রপ্তানী আয় ক্রমাগত ভাবে কমেছে। পাটখাত হতে এই ক্রমহ্রাসমান আয়ের অন্যতম কারণ হলো কৃত্রিম তন্তুর সাথে পাটের অসম প্রতিযোগিতা। চিত্র-২ হতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পাটের সেই সোনালী দিন আর নেই। তাছাড়া পূর্বে উল্লেখিত ধানচাষ-পাটচাষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাটের সুযোগ ব্যয় (Opportuity Cost) বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ। এর ফলে পাটের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চিত্র-২ এ সর্বোচ্চ রেখা শিল্পজাত পণ্য হতে রপ্তানী আয়ের প্রবণতা নির্দেশক। কিন্তু এই প্রবণতা রেখা একই সঙ্গে তৈরী পোশাক শিল্প হতে রপ্তানী আয়েরও প্রবণতা নির্দেশক, কারণ তৈরী পোশাক শিল্প, শিল্প খাতের অর্ন্তভূক্ত।

পণ্য বাণিজ্য শর্ত

একটি দেশ শুধুমাত্র তার নিজস্ব পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করে তা নয়, বরং তার নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্যদেশ হতে পণ্যসামগ্রী আমদানীও করতে হয়। কোন দেশ তার নির্দিষ্ট পরিমাণ রপ্তানী পণ্যের বিনিময়ে কি পরিমাণ পণ্য অন্য আরেকটি দেশ হতে আমদানী করতে পারবে তা বাণিজ্য শর্তের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। বাণিজ্য শর্ত বলতে সেই শর্তকে বুঝায়, যে শর্তের মাধ্যমে একটি দেশের পণ্য সামগ্রী অন্য আরেকটি দেশের পণ্য সামগ্রীর সাথে বিনিময় হয়। যখন কোন দেশের রপ্তানী পণ্যের মূল্যসূচক আমদানী পণ্যের মূল্যসূচক অপেক্ষা বেড়ে যায়, তখন সাধারণ ভাবে বলা হয় যে, বাণিজ্য শর্তের উন্নতি ঘটেছে।

অর্থাৎ এ অবস্থায় একই পরিমাণ পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করে পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সামগ্রী আমদানি করা সম্ভব হয়। অপরপক্ষে, যখন কোন দেশের আমদানি পণ্যের মূল্যসূচক রপ্তানী পণ্যের মূল্যসূচক অপেক্ষা বেড়ে যায়, তখন সাধারণভাবে বলা হয় যে, বাণিজ্য শর্তের অবনতি ঘটেছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় একই পরিমাণ পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করে পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ পণ্য সামগ্রী আমদানি করা যায়। এই তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে, সারণী-৫ এ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্য বাণিজ্য শর্তের গতি-প্রকৃতি দেখানো হয়েছে। সারণীতে দেখা যায় যে, ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে রপ্তানী মূল্যসূচক ছিল ১০১.৯ এবং আমদানী মূল্যসূচক ছিল ১০৭.৪ এবং এই বছরে পণ্যবাণিজ্য শর্ত ২.৩ ভাগ উন্নতি লাভ করে। অপরদিকে ১৯৯১/৯২ সালে ১.৪ ভাগ, ১৯৯২/৯৩ অর্থবছরে ৩.৫ ভাগ এবং ১৯৯৩/৯৪ অর্থবছরে ২.৭ ভাগ উন্নতি লাভ করে। কিন্তু ১৯৯৪/৯৫ সালে পণ্যবাণিজ্য শর্তের ২.২ ভাগ ও ১৯৯৫/৯৬ সালে ০.৬ ভাগ অবনতি ঘটে।

সারণী-৫। পণ্য বাণিজ্য শর্ত এবং শর্তের বার্ষিক পরিবর্তন

(ভিত্তিঃ ১৯৭৯-৮০=১০০)

বছর	রপ্তানী মূল্যসূচক	আমদানী মূল্যসূচক	পণ্য বাণিজ্য শর্ত*
১৯৯০-৯১	১০১.৯	১০৭.৪	৯৪.৯
	(৬.৬)	(৪.৩)	(২.৩)
১৯৯১-৯২	১০০.৪	১০০.৪	৯৬.২
	(-১.৫)	(-২.৮)	(১.৪)
১৯৯২-৯৩	১০৭.৩	১০৭.৮	৯৯.৬
	(৬.৯)	(৩.২)	(৩.৫)
১৯৯৩-৯৪	১১৩.৩	১১০.৮	১০২.৩
	(৫.৬)	(২.৮)	(২.৭)
১৯৯৪-৯৫সা	১২০.৮	১২০.৭	১০০.১
	(৬.৬)	(৮.৯)	(-২.২)
১৯৯৫-৯৬সা	১২৮.৯	১২৯.৫	৯৯.৫
	(৬.৭)	(৭.৩)	(-০.৬)
১৯৯৬-৯৭সা	১৩৫.০	১৩৩.৪	১০১.২
	(৪.৮)	(৩.০)	(১.৭)
১৯৯৭-৯৮সা	১৪০.২	১৩৭.৯	১০১.৭
	(৩.৮)	(৩.৪)	(০.৫)

* পণ্য বাণিজ্য শর্ত = (রপ্তানী মূল্য সূচক / আমদানী মূল্য সূচক) × ১০০

সা = সাময়িক। নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের হার নির্দেশক

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯) বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮, পৃ: ৭১।

১৯৯৬/৯৭ সালের তুলনায় ১৯৯৭/৯৮ সালে রপ্তানী পণ্যের মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায় ৩.৮ ভাগ। অন্যদিকে, আমদানী পণ্যের মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩.৪ ভাগ।

ফলে ১৯৯৬/৯৭ সালের তুলনায় ১৯৯৭/৯৮ সালে পণ্য বাণিজ্য শর্তে শতকরা ০.৫ ভাগ উন্নতি ঘটে।

৬। পঞ্চবার্ষিক মেয়াদী রপ্তানী উন্নয়ন নীতি

বাংলাদেশ মুক্ত বাজার অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামোর আলোকে রপ্তানী উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের রপ্তানী আয় এবং আমদানী ব্যয়ের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে সংকোচন, পণ্যের বহুমুখীকরণ, অধিকতর দেশীয় উপাদান সংযোজনের লক্ষ্যে রপ্তানীমুখী শিল্পের সাথে পশ্চাৎঅন্বয়ী (Backward linkage) শিল্প ও সেবাসমূহের সংযোগ স্থাপন; পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর বাজারোপযোগীকরণ; আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্টকরণ, রপ্তানীবাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, রপ্তানী পণ্য উৎপাদনে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ, রপ্তানী সম্প্রসারণে বেসরকারীখাতকে অধিকতর সম্পৃক্তকরণ, ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক নীতির পরিবর্তে পাঁচ বছর মেয়াদী রপ্তানী নীতি (১৯৯৭-২০০২) গ্রহণ করেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সত্তর ও আশির দশকের দিকে পণ্য বাণিজ্য কৌশল ছিল আমদানী বিকল্প শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে পণ্য বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়ন। কিন্তু এই কৌশল খুব বেশী উপকারে আসেনি। তাই বিশ্ব বাজারের সাথে অভ্যন্তরীণ বাজারের অন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নব্বই দশকে উদার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য ইতোমধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা উদারীকরণ এবং টাকাকে চলতি হিসাবে বিনিময়যোগ্য করা হয়। উরুগুয়ে রাউন্ড বাণিজ্য চুক্তির প্রেক্ষাপটে পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক চলাচলের উপর আরোপিত কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা যথাসম্ভব দূর করে, রপ্তানী নির্ভর উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী বাণিজ্য নীতির লক্ষ্য। পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০১/০২ সালে রপ্তানীর লক্ষমাত্রা ১৯৯৬/৯৭ এর মূল্যসূচক অনুযায়ী ধরা হয়েছে ৭৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ সরকার: ১৯৯৮, পৃ: ৯৮)। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন রপ্তানী নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই নতুন রপ্তানী নীতির উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন;
- রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে সংকোচন ;

- বিদ্যমান বাজার সংরক্ষণ ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রপ্তানী পণ্য উৎপাদনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- উরুগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী উদারীকৃত এবং ভূমন্ডলীকৃত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগসমূহ গ্রহণের সর্বাধিক প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- রপ্তানী প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও রপ্তানী সুযোগ সুবিধা যৌক্তিকীকরণ ও সুসংহতকরণ;
- রপ্তানী বাণিজ্যের অবকাঠামো উন্নয়ন;
- রপ্তানীখাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনসম্পদ সৃষ্টি;
- রপ্তানী পণ্যের মান এবং গ্রেডিং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্তরে উন্নীতকরণ।

এই উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১। উচ্চ মূল্যের নতুন ও অধিক মূল্য সংযোজিত ক্যাটাগরির তৈরী পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য শিল্প, কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং এগ্রো-প্রসেসিং খাতকে এ রপ্তানী নীতিতে থ্রাষ্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিতকরণ;

২। ন্যূনতম শতকরা ৮০ ভাগ রপ্তানীমুখী চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা প্রদান এবং অনুরূপ অন্যান্য রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শুল্ক ও কর সুবিধা বাদে শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান;

৩। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রিখাতে পৃথক লাইন ব্যবহার সহজতর করার উদ্দেশ্যে শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী উক্ত শিল্পের জন্য বেসরকারী খাতে আন্তর্জাতিক ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপনের অনুমতি প্রদানসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানীর অবকাঠামো উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত তথ্য প্রযুক্তি পল্লী স্থাপন এবং সফটওয়্যার বিপণন সুবিধার জন্য কপিরাইট আইনে সফটওয়্যার সংক্রান্ত অধ্যায় সংযোজন;

৪। Export Credit Guarantee Scheme এর আওতায় রপ্তানী উন্নয়ন ও সম্প্রসাররণর স্বার্থে সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা নিরসন করে স্কীমকে পুনর্বিন্যাস ও জোরদারকরণ;

৫। রপ্তানী হতে উদ্ভূত আয়ের উপর প্রদেয় করের শতকরা ৫০ ভাগ প্রতি বছর অর্থ আইনে রেয়াত দেবার প্রথা পরিবর্তন করে আয়কর আইনের

অধীনে যে কোন রপ্তানী ব্যবসা হতে উদ্ভূত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ কর মুক্ত করার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রে রপ্তানী পণ্য আয়ের শতকরা ০.৫ ভাগ উৎস করের পরিবর্তে শতকরা ০.২৫ ভাগ নির্ধারণ;

৬। আকাশ পথে ক্র্যাশপ্রোগ্রামভূক্ত সকল পণ্য (ফলমূল ও শাক-সব্জিসহ) রপ্তানী ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান এবং বিদেশী এয়ারলাইন্সসমূহের কার্গো সার্ভিস ব্যবহারের জন্য বর্তমানে সিভিল এভিয়েশান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত রয়্যালটি প্রত্যাহারকরণ;

৭। হিমায়িত খাদ্য, চা ও চামড়া রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ঋণ প্রাপ্তির জন্য ফার্ম কন্ট্রাক্ট / ঋণপত্র দাখিলের শর্ত শিথিলকরণ এবং চলতি মূলধনকে রপ্তানী ঋণ হিসেবে বিবেচনা করে রেয়াতী হারে সুদ পরিশোধের সময়সীমা ১৮০ দিনের পরিবর্তে ২৭০ দিনে বর্ধিতকরণ;

৮। ইপিজেড বহির্ভূত শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত আমদানীর সুবিধা প্রদান;

৯। রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ এবং পণ্যের মান উন্নয়ন লক্ষ্যে নমুনা আমদানীর সুবিধা বার্ষিক ১০০০ ডলার এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এর উর্ধ্বে নির্ধারণ এবং বাণিজ্য মেলা ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত রপ্তানী পণ্যের নমুনা প্রেরণের আর্থিক সীমা বার্ষিক ১৫০০ মার্কিন ডলারে পুনঃ নির্ধারণ, সর্বোপরি পার্শেল পোষ্টে নমুনা প্রেরণে মূল্যসীমা বর্তমানের ২,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকায় উন্নীতকরণ;

১০। তৈরী পোশাক শিল্প ও দেশীয় বস্ত্র খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের অনুকূলে শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে শতকরা ২৫ ভাগ বিকল্প সুবিধা প্রদান; রপ্তানী পণ্যের উপকরণ আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র-ব্যাক এর সুবিধা গ্রহণ করা না হলে অথবা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহার করা হলে স্থানীয় বস্ত্র উৎপাদনকারী তথা সরবরাহকারী (একই প্রতিষ্ঠান হতে হবে) এবং রপ্তানীকারক মধ্যবর্তী ক্রেতা হলে পণ্যের উৎপাদনকারীকে উক্ত সুবিধা প্রদান;

১১। চামড়া ও তৈরী পোশাকসহ ১০০% রপ্তানীমুখী অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে বাতিলকৃত অংশের প্রযোজ্য কর শতকরা ২০ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা এবং ১০০% রপ্তানীমুখী

শিল্প হিসেবে বিবেচিত সকল শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যার হাউস সম্প্রসারণ করা হবে;

১২। ফরেন কারেন্সি একাউন্টে মার্কিন ডলার অথবা পাউন্ড স্টার্লিংয়ে রপ্তানীকারকের জমা রাখার সীমা এফওবি রপ্তানী আয়ের শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৪০ ভাগে উন্নয়ন করা, তবে যে সব পণ্যের আমদানীর অংশ তুলনামূলক ভাবে বেশী সেগুলোর ক্ষেত্রে এবং সেবা রপ্তানীকারকগণকে তাদের এফওবি রপ্তানী আয়ের ৭.৫ শতাংশের জন্য এ সুবিধার ব্যবস্থাকরণ;

১৩। প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে রপ্তানীকারকদের ক্রেডিট কার্ড প্রদান অব্যাহত রাখার, প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্র সুদৃঢ় চুক্তির অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণপত্র / চুক্তিতে বর্ণিত মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত রপ্তানী ঋণ প্রাপ্তির, নবাগত রপ্তানীকারকদের উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত ব্যাংক রপ্তানী ঋণের জন্য আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করার এবং স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অনুকূলে / অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাকরণ। অমোচনীয় ঋণপত্রের অধীনে সাইট পেমেন্ট ভিত্তিতে যদি রপ্তানী করা হয়, তাহলে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারডিউ সুদে ধার্য করতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রপ্তানীকারকদেরকে প্রয়োজনীয় রপ্তানী দলিলপত্র জমা দিতে হবে।

১৪। ২০০০ সাল পর্যন্ত ক্রাষ্ট চামড়া রপ্তানীর মেয়াদবৃদ্ধি করা, ওয়েট ব্লু ও পিকেলডসহ কাঁচা চামড়া আমদানী কার্যক্রম বহাল রাখা এবং কাঁচা চামড়া আমদানীর ক্ষেত্রে ৩ বছরের জন্য বর্তমান প্রচলিত কাস্টমস ডিউটি (২.৫%), আমদানী লাইসেন্স ফি (২.৫%) মওকুফ করা হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা নিতে আগ্রহী নয় এবং যাদের বন্ডেড ওয়্যার হাউস নেই তাদের ডিউটি-ড্র-ব্যাকের সমপরিমাণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

উপসংহার

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্ব অর্থনীতি উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছে। বর্তমানে বিশ্ব এক গ্লোবাল ভিলেজ হতে চলেছে। ২০০৫ সাল নাগাদ সকল কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতাহীন যে বিশ্ব অর্থনীতি দেখা দিবে তা হবে প্রচন্ড প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব। তখন "Survival of the fittest" কথাটি হবে একমাত্র খাঁটি সত্য কথা। শুধুমাত্র সেরা এবং যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানই সেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে আর অযোগ্য এবং দুর্বল প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে বিদায়। জি এস পি সুবিধার কারণে বাংলাদেশ এখনও ইউরোপের বাজারে চীন, ভারত ও শ্রীলংকার তুলনায় শতকরা ১২.৫ ভাগ কম শুল্কে তৈরী পোশাক রপ্তানী করতে পারছে (বাংলাদেশ ব্যাংকঃ ১৯৯৮, পৃঃ ১৪)। ২০০৫ সালে গ্যাট চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত হলে এই সুবিধা রহিত হবে। যার ফলে বাংলাদেশ তার তৈরী পোশাক শিল্পের রপ্তানী বাজার হারাতে পারে এবং রপ্তানী বাণিজ্য চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে।

সুতরাং এখন থেকে আমাদের সাবধানতার সাথে সামনে অগ্রসর হতে হবে। তৈরী পোশাক শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা এবং একই সাথে দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে এবং যে কোন মূল্যে তৈরী পোশাক শিল্পের বাজার রক্ষা করতে হবে। রপ্তানী খাতে আরও নতুন নতুন পণ্যের বিচিত্র সহমাহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান কম্পিউটার সফটওয়্যার বাজারে বাংলাদেশকে তার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। বর্তমানে টাটকা সব্জি, ফুল এবং অন্যান্য অপ্রচলিত পণ্যের যে বাজার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশে নতুন নতুন বাজার খুজে বের করতে হবে।

আশা করা যায় বর্তমান রপ্তানী নীতি, রপ্তানী ক্ষেত্রে সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বর্তমান রপ্তানী নীতি, সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এবং সম্ভাব্য সকল সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জাপান, সিংগাপুর এবং হংকং এর মত অর্থনৈতিক পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হতে পারে। আমরা এই আশাটুকু করতে পারিনা কি?

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যসমূহ এবং পণ্যওয়ারী রপ্তানী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

পণ্য সমূহ	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
ক) প্রাথমিক পণ্য সমূহ								
১। কাঁচা পাট	১০৪	৮৫	৭৪	৫৭	৭৯	৯১	১১৬	১০৮
২। চা	৪৩	৩২	৪১	৩৮	৩৩	৩৩	৩৮	৪৭
৩। হিমায়িত খাদ্য	১৪২	১৩১	১৬৫	২১১	৩০৬	৩১৪	৩২১	২৯৪
৪। কৃষিজ পণ্য	৮	১০	১৫	১৫	১৩	২২	২৯	--
৫। অন্যান্য প্রাথমিক পণ্যসমূহ	১০	১০	১৯	২৬	২১	১৬	২২	--
মোট প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ (১-৫)	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৪৪৯
খ) শিল্পজাত পণ্য								
৬। পাটজাত দ্রব্য	২৯০	৩০১	২৯২	২৮৪	৩১৯	৩২৯	৩১৮	২৮১
৭। চামড়া	১৩৪	১৪৪	১৪৮	১৬৮	২০২	২১২	১৯৫	১৯০
৮। ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল, বিটুমিন	৩২	৮	৩৭	১৬	১৪	১১	১৬	--
৯। তৈরী পোষাক ও নীটওয়্যার সামগ্রী	৮৬৭	১,১৮৩	১,৪৪৫	১,৫৫৬	২,২২৮	২,৫৪৭	৩,০০১	৩,৭৮৪
১০। রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৪০	২৫	৫৫	৫৪	১০৮	৯৮	১০৮	৭৪
১১। কাগজ ও সহজাত	৫	৬	৩	-	-	-	-	-
১২। হস্তশিল্পজাত পণ্য	৫	৯	৫	৭	৬	৬	৬	৬
১৩। ইন্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৬	৯	১৮	৪	১০	১৩	১৬	-
১৪। অন্যান্য শিল্প-জাত পণ্য	৩২	৪১	৬৬	৯৮	১৩৪	১৮৯	২৪১	৩৭৭
মোট শিল্পজাত (৬-১৪)	১,৪১১	১,৭২৬	২,০৬৯	২,১৮৭	৩,০২১	৩,৪০৬	৩,৯০১	৪,৭১২
সর্বমোট (ক+খ)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮২	৪৪২৭	৫১৬১

উৎসঃ বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮, পৃঃ ১৩০।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmad. Muzaffar (1989). "Readymade Garment Industry in Bangladesh." Bangladesh Journal of Political Economy. Vol.9. No.2

Government of Bangladesh (1973). *The First Five Year Plan. 1973-78*. Dhaka: Plannig Commission. Ministry of Plinnig.

Government of Bangladesh (1983). *The Second Five year Plan.1980-85*. Dhaka: planning Commission. Ministry of Planning.

Government of Bangladesh (1985).TheThird Five year Plan, 1985-90. Dhaka: Planning Commission. Ministry of Planning.

Government of Bangladesh (1990). *TheFourth Five year Plan.1990-95*. Dhaka: planning Commission. Ministry of Planning.

Government of Bangladesh (1996). *Bangladesh Export Statistics*. Dhada: Export promotion Bureau.

Government of Bangladesh (1998). *The Fifth Five year Plan. 1997-2002*. Dhaka: Planning Commission. Ministry of Planning.

Hossain. MD. Belayet (1983). "Some Analysis of the Structural Change of Bangladesh's Export Trade." *Bangladesh Jorurnal of Political Ecnomy. Vol.6. No.2.*

Islam. Aminul M and Quddus. Munir (1996). "the Export Garment Industry in Bangladesh: A political Catalyst for Breakthrough." N..M Wahid and Charles E. Weis (Eds). *The Economy of Bangladesh Problems and Prospects.* London: Praeger.

Islam. Muhammed N and Iftekharuzzaman (1996). "Export- Growth Nexus in a Small Open Economy : The Case of Bangladesh." N.M Wahid and Charles E.Weis (eds). *The Economy of Bangladesh Problems and Prospects*. London: Praeger

Khan. Ershadullh (1983). "Implication of Developments in International Trade on developing Countries with Special Reference to Bangladesh.." *Bangladesh Journal of Political Economy. Vol.6. No.2.*

Rahman. M Lutfor (1983). Export Trade of Bangladesh: Pattern and Directon of Change Over the Last Ten Years." *Bangladesh Journal of Political* Economy. Vol.6, No.2.

Rahman. Mustafa Abdur and Hasan. Mlohammad Sayed (1983). "External Trade of Bangladesh in Retrospect. "Bangladesh Journal of Political Economy. Vol.6. No.2.

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯)। *বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৭/৯৮*। ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *রপ্তানী আয় ১৯৮৮-৮৯।* ঢাকা: পরিসংখ্যান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *রপ্তানী আয় ১৯৯৩-৯৪।* ঢাকা: পরিসংখান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *রপ্তানী আয় ১৯৯৪-৯৫*। ঢাকা: পরিসংখান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *রপ্তানী আয় ১৯৯৫-৯৬।* ঢাকা: পরিসংখান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *(১৯৯৮)। বাংলাদেশ ব্যাংক পরি*ক্রমা মাসিক ঘরোয়া পত্রিকা

বাংলাদেশ সরকার *(১৯৯৮)। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৭, ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *বাংলাদেশ সরকার।*

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ (বিভন্ন সংখ্যা ১৯৮৯/৯০ হতে ১৯৯৩/৯৪*)* ঢাকা: অর্থ বিভাগ, মন্ত্রণালয়।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

'উন্নয়ন' ধারার ২৭ বছরঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ

আনু মুহাম্মদ*

'Development' in 27 Years: An Anatomical Discourse on Bangladesh Economy, State and Society. Anu Muhammad.

Abstract : This article attempts to evaluate the economy of Bangladesh in a comprehensive way. Keeping twenty-seven years of Bangladesh, after its independence. in perspective, this goes for an anatomical discourse to understand dynamics, constraints and the direction of Bangladesh Economy. Moreover, taking into account the fact that economy does not move automatically, role of the Bangladesh Stare and to other institutions, namely the World Bank and the Non Governmental Organizations (NGOs) are also brought under review. The nature of economic growth/ 'development' has its corresponding impact upon the social fabrics and the people at large. Analysis of the impact has taken place in the last part of the article. From empirical presentation and as well as objective analysis the article reached to the conclusion that, Bangladesh, in the last 27 years, has grown in many ways. Market relations has replaced old non- market economy and pre-capitalist social relations in a significant way. Bangladesh is now more integrated in global economy than anytime before. But, despite its apparent progress and growth in GDP Bangladesh could not change its peripheral status in global economy. Secondly, economic growth could not take course to ensure productive development. On the contrary, it increasingly went towards a socio-economic formation where not the entrepreneurs but the commission agents, bank-defaulters, lumpen multi-millionaires gained dominance. And thirdly, as a result, growth of resources went hand in hand with accumulation, monopolization and wastage of resources as well as increasing inequality.

বর্তমান প্রবন্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার অংশ। পর্যালোচনার সময়কাল ধরা হয়েছে প্রধানতঃ স্বাধীনতা-উত্তর পঁচিশ বছর। তবে কোথাও কোথাও আরও কিছু সময় পর, সাতাশ বছর পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেশের অর্থনীতি পর্যালোচনাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে তিনটি ভাগে বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, অর্থাৎ অর্থনীতির সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতির পরিচালনাকারী বা অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিসমূহের পর্যালোচনা। এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (১) রাষ্ট্র ও সরকার (২) বিশ্বব্যাংক এবং (৩) এনজিও। তৃতীয়তঃ অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির এবং অর্থনীতির পরিচালকদের ভূমিকায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব নির্দিষ্টকরণ।

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

এক। অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি

মোট জাতীয় উৎপাদন

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য প্রথমে মোট জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণগত দিক ও সেইসঙ্গে তার গুণগত দিক অর্থাৎ তার গঠনের পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। তবে এ কাজ করতে গিয়ে কিছু সমস্যার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। পদ্ধতিগত সমস্যা এবং আওতা দুদিক থেকেই জিডিপি পরিমাপের সীমাবদ্ধতা আছে, এছাড়া দুর্বল তথ্যগত ভিত্তিতো আছেই। দেশে এখন এ রকম অনেক অর্থনৈতিক তৎপরতা আছে যেগুলো সরাসরি জিডিপি পরিমাপে ঠিকমতো প্রতিফলিত হয় না, উল্লেখ করা যায়- পারিবারিক শ্রম, নারীর 'গার্হস্থ' শ্রম-বাজার বহির্ভূত শ্রম, শিশু শ্রম, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, তালিকা বহির্ভূত অর্থনৈতিক তৎপরতা, 'কালো' অর্থনীতি, পরিবেশগত ব্যয় ইত্যাদি। এসব সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখেও আমরা প্রাপ্ত জিডিপি সংক্রান্ত তথ্য থেকে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাই। বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭২ থেকে ১৯৯৮ সাল নাগাদ জাতীয় উৎপাদন ৪৯৮৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে চলতি বাজার দরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকায় উঠেছে। টাকার অংকে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪ গুণ।

স্বাধীনতার আগে জিডিপিতে কৃষির অংশ ছিল শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি এবং শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মানুষ কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। বাংলাদেশ তখন প্রকৃত অর্থেই কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। ২৫ বছরে জিডিপির এই গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৮ সালে কৃষির অবদান দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ, অর্ধেকের অনেক কম। অন্যদিকে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের শতকরা হার যদিও এখন পর্যন্ত শতকরা ৫০ ভাগের বেশি দেখা যায় তবুও পাশাপাশি এ কথাটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, এখন আর গ্রাম মানেই কৃষি নয়- গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির অবদান আগে নিরঙ্কুশ থাকলেও এখন অকৃষি তৎপরতা গ্রামীণ অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কজেই কৃষির উপর নির্ভরশীল বলে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর বড় অংশের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠিত হয় অকৃষি অর্থনৈতিক তৎপরতা থেকে। সুতরাং বাংলাদেশকে এখন আর কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে না।

১৯৭২ সালে অনেক ব্যবধান থাকলেও কৃষির পরই শিল্প, শতকরা হারে জিডিপিতে অবস্থান ছিল প্রায় ৯ ভাগ, ২৫ বছরের মাথায় জিডিপিতে শিল্পের অবদান দাঁড়িয়েছে ১০ ভাগের কিছু বেশি। উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায় সেবা,

নির্মাণ ও ব্যবসা খাতে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, বিভিন্ন ধরনের সেবা একত্রিত করলে এটাই একক বৃহত্তম খাত হয়, যা জিডিপির শতকরা ৫২ ভাগ। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ২৫ বছরে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থেকে সেবাপ্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে; শিল্পখাত মাঝখানে অর্থনীতিকে কোনভাবে পরিচালনার শক্তি দেখাতে পারেনি। অর্থনীতির মূল চেহারা তার ফলে ব্যবসা ও সেবা খাত দ্বারাই নির্ধারিত হচ্ছে । পেশা, আয়ের উৎস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুস্পষ্ট ।

৯০ দশকের বছরগুলোতে গড় জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়। জাতীয় সঞ্চয়ের অগ্রগতিতে বিদেশ থেকে পাঠনো প্রবাসীদের টাকার একটি বড় ভূমিকা আছে। বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির ধরনও গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনশীল খাতগুলোতে বিনিয়োগের হার উঁচু নয়। এগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যাবে কেন বিনিয়োগের মোটামুটি উচ্চ হার হার এবং উৎপাদনশীল খাতের স্থবিরতা ও তথাকথিত বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা এক সঙ্গেই অবস্থান করে।

কৃষি

বাংলাদেশের কৃষির চেহারা এককথায় বহুমাত্রিক। কৃষির একটি চেহারা মূলতঃ এদেশের মাটি, পরিবেশ ও মানুষের অব্যাহত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। কৃষির এই চেহারা এদেশে দীর্ঘদিনের জীববৈচিত্র ও মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে বাংলাদেশের বর্তমান কৃষির প্রধান চেহারা গঠন করেছে ৬০ দশকে বিশ্বব্যাপী 'সবুজ বিপ্লব' নামে উফশী বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ ও যান্ত্রিক সেচ সম্বলিত যে কৃষি ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও প্রবেশ করেছিল সেটিই।

স্বাধীনতা-উত্তর কালের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আমন ও আউশ ধানের জমি কমেছে, বোরো ও গমের বেড়েছে। অন্যদিকে পাটের জমি কমেছে। উৎপাদনশীলতা পরীক্ষা করলে আমরা দেখি ১৯৭০ থেকে ২৫ বছরে আমন, আউশ, বোরো ও গমের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ৩০.১৯, ২৩.৩৯, ১২.৯৭, ১২৪.৮৪ ভাগ। কিন্তু একই সময়ে সারের ব্যবহার বেড়েছে ৭৬৪.৮৪% এবং সারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় ১৩০০ ভাগ। উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। বিভিন্ন ফসলের মুনাফার হারের হিসাবে দেখা যায় এক উফশী আমন ছাড়া দেশী আমন ও উফশী বোরোতে মুনাফার হার কমেছে।

সারণী-১। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

(একর প্রতি ফলনঃ মণ)

শস্য	১৯৬৯-৭০	১৯৭৮-৭৯	১৯৮৫-৮৬	১৯৯৪-৯৫	২৫ বছরে বৃদ্ধির হার (%)
আমন	১২.৭৫	১৪.০৯	১৫.৩৩	১৬.৬০	৩০.১৯
আউশ	৯.৫৩	১১.২৭	১০.৬৭	১১.৭৬	২৩.৩৯
বোরো	২৩.৭৩	১৯.৮৩	২৫.৯১	২৬.৮১	১২.৯৭
গম	৯.৪৬	২০.২৩	২১.৭৮	২১.২৭	১২৪.৮৪

সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৮০, ৮১, ৯০, ৯১, ৯৬।

দেশে কৃষি আবাদের অভিজ্ঞতাকে অধিকতর গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে না এগিয়ে কৃষিকে আমদানী করা বিপদজনক প্রযুক্তির মুখে ফেলে দেয়ার পেছনে এদেশের উন্নয়ন দর্শন, আন্তর্জাতিক পুঁজির ভূমিকা, শাসক শ্রেণীর অবস্থান ইত্যাদি বরাবরই কার্যকর ছিল। প্রথমে বিদেশী সাহায্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভর্তুকী দিয়ে এই কৃষি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কৃষকরা এই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবার পর ভর্তুকী ক্রমাগত তুলে নেয়া হচ্ছে। এই আমদানী করা প্রযুক্তি চালু করবার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল মূখ্য, সেই বিএডিসিও ক্রমেই বাহুল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ ছিল ৩,৮৪,০০০ টন, ১৯৮৫-৯৬ সালে এটি পৌছায় ২৯, ৩৭,০০০ টনে অর্থাৎ এই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭ গুণ (বিবিএস, ১৯৯৬)। ১৯৬৮-৬৯ সালে ইউরিয়া ও টিএসপি'র জন্য ভর্তুকীর গড়পড়তা হার ছিল ৫৮%। ১৯৭৬ সালে ইউরিয়ার জন্য এটি দাঁড়ায় শতকরা ৫২ ভাগ এবং ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকারী বাজেটের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ খরচ হতো কৃষিখাতে, যার প্রায় ২৮ ভাগই খরচ হতো সারের ভর্তুকীতে (হোসেন, ১৯৯৫)। ৭০ দশকের শুরু থেকেই ভর্তুকী হ্রাসের জন্য 'দাতা' সংস্থাসমূহের পরামর্শ বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালে গড়পড়তা ভর্তুকী হার ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ, ৮৪সালে এটি কমে দাঁড়ায় শতকরা ২৫ ভাগ। ক্রমাগতঃ ভর্তুকী হ্রাসের কারণে দামও বাড়তে থাকে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্তই সারের দাম বাড়ে ১০ গুণ।

স্বাধীনতার পর কৃষি উৎপাদনের এই মডেলটি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সার, কীটনাশক ও যান্ত্রিক সেচকে অবিচ্ছেদ্য হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। কৃষিতে এই 'আধুনিক' প্রযুক্তির প্রয়োগ

সারণী-১৭ কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

(একর প্রতি ফলনঃ মণ)

শস্য	১৯৬৯-৭০	১৯৭৮-৭৯	১৯৮৫-৮৬	১৯৯৪-৯৫	২৫ বছরে বৃদ্ধির হার (%)
আমন	১২.৭৫	১৪.০৯	১৫.৩৩	১৬.৬০	৩০.১৯
আউশ	৯.৫৩	১১.২৭	১০.৬৭	১১.৭৬	২৩.৩৯
বোরো	২৩.৭৩	১৯.৮৩	২৫.৯১	২৬.৮১	১২.৯৭
গম	৯.৪৬	২০.২৩	২১.৭৮	২১.২৭	১২৪.৮৪

সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৮০, ৮১, ৯০, ৯১, ৯৬।

দেশে কৃষি আবাদের অভিজ্ঞতাকে অধিকতর গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে না এগিয়ে কৃষিকে আমদানী করা বিপদজনক প্রযুক্তির মুখে ফেলে দেয়ার পেছনে এদেশের উন্নয়ন দর্শন, আন্তর্জাতিক পুঁজির ভূমিকা, শাসক শ্রেণীর অবস্থান ইত্যাদি বরাবরই কার্যকর ছিল। প্রথমে বিদেশী সাহায্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভর্তুকী দিয়ে এই কৃষি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কৃষকরা এই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবার পর ভর্তুকী ক্রমাগত তুলে নেয়া হচ্ছে। এই আমদানী করা প্রযুক্তি চালু করবার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল মূখ্য, সেই বিএডিসিও ক্রমেই বাহুল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ ছিল ৩,৮৪,০০০ টন, ১৯৮৫-৯৬ সালে এটি পৌছায় ২৯, ৩৭,০০০ টনে অর্থাৎ এই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭ গুণ (বিবিএস, ১৯৯৬)। ১৯৬৮-৬৯ সালে ইউরিয়া ও টিএসপি'র জন্য ভর্তুকীর গড়পড়তা হার ছিল ৫৮%। ১৯৭৬ সালে ইউরিয়ার জন্য এটি দাঁড়ায় শতকরা ৫২ ভাগ এবং ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকারী বাজেটের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ খরচ হতো কৃষিখাতে, যার প্রায় ২৮ ভাগই খরচ হতো সারের ভর্তুকীতে (হোসেন, ১৯৯৫)। ৭০ দশকের শুরু থেকেই ভর্তুকী হ্রাসের জন্য 'দাতা' সংস্থাসমূহের পরামর্শ বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালে গড়পড়তা ভর্তুকী হার ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ, ৮৪সালে এটি কমে দাঁড়ায় শতকরা ২৫ ভাগ। ক্রমাগতঃ ভর্তুকী হ্রাসের কারণে দামও বাড়তে থাকে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্তই সারের দাম বাড়ে ১০ গুণ।

স্বাধীনতার পর কৃষি উৎপাদনের এই মডেলটি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সার, কীটনাশক ও যান্ত্রিক সেচকে অবিচ্ছেদ্য হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। কৃষিতে এই 'আধুনিক' প্রযুক্তির প্রয়োগ

ও বিস্তারের ফলাফল অনেকদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি হল উফশী বীজের মাধ্যমে ধান উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি- ২৫ বছরে ধান উৎপাদন যে প্রায় দুইগুণ বেড়েছে তার পেছনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু একই ঘটনার অন্যান্য ফলাফল বা প্রভাব নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা খুবই কম হয়েছে। এগুলো হল (ক) অনেক প্রজাতির ধানের অবলুপ্তি, (খ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারের কারণে মাটি ও পানিতে বিরূপ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া; যার প্রভাবে মাটির উর্বরতা হ্রাস, মৎস্য সম্পদের বিপুল ক্ষতি, (গ) প্রাণবৈচিত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও নতুন নতুন পোকামাকড়ের আমদানী, (ঘ) ভূগর্ভস্থ পানি হ্রাস, (ঙ) কৃষকের প্রকৃতি-নির্ভর অভিজ্ঞতার অপচয় এবং (চ) ফসলের বৈচিত্র হ্রাস।

শিল্প

স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে যে শিল্প ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তার বয়সও খুব বেশিদিনের নয়। মধ্যপঞ্চাশ দশকে এদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া হয় এবং তার প্রভাবেই পাট, বস্ত্র, কাগজ, চিনি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশকিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইপিআইডিসি) পৃষ্ঠপোষকতায় ৭৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, বেশির ভাগই ছিল পাটশিল্প। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য দিক হলো মূলধন গঠনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার হার ছিল সাধারণভাবে শতকরা ৭০ ভাগ, কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ৯২.৫ ভাগ। এভাবে যে শিল্পভিত্তি গড়ে উঠে তার মধ্যে বিশেষভাবে পাটখাত ছিল আবার কৃত্রিমভাবে লাভজনক। রপ্তানি বোনাস ভাউচার স্কীম বিবেচনা করলে এই বেসরকারী শিল্পভিত্তি ছিল লোকসানী খাত, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মালিকদের জন্য যা ছিল লাভজনক। এই শিল্পখাত আবার প্রধানতঃ ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে। স্বাধীনতার পর পরিত্যক্ত এসব শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতই হয়ে দাঁড়ায় শিল্পের মূলধারা। মোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল সরকারী খাতে, যেগুলোকে ৭টি সংস্থার অধীনে বিন্যস্ত করা হয়।

বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল, সিলিং দেয়া ছিল ২৫ লাখ টাকা। বলাই বাহুল্য যে, সিলিং না থাকলেও সে সময় বিনিয়োগ করবার মতো বাঙালী উদ্যোক্তা পাওয়া কঠিন হতো। তবে শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং দেশে নতুন সম্পত্তিশালী শ্রেণী গঠিত হবার প্রক্রিয়ায় মূলধন সংবর্ধন মূলতঃ 'বেআইনী' ধারাতেই সংগঠিত হয়। এর

প্রতিফলনই ক্রমান্বয়ে সিলিং পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায়। ১৯৭৪ সালে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের সিলিং পরিবর্তন করে ৩ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়, ১৯৭৫ সালে এটি হয় ১০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৭ সালে এটি পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৭৭, ১৯৮২, ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে যেসব শিল্পনীতি ঘোষিত হয় সেগুলোর লক্ষ্য মূলতঃ এক একরৈখিক-রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রাধান্য কমানো, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ ও এগুলোর ক্ষেত্রে সরকারী নানা সমর্থন সম্প্রসারণ। ১৯৯১ সালের মধ্যে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের উপর বিধিনিষেধ পুরোটাই উঠে যায়।

সারণী-২। শিল্প খাতের উৎপাদন সূচক, ১৯৯৪-৯৫

দ্রব্য	১৯৮৫-৮৬ ভিত্তিঃ১৯৭৩-৭৪=১০০)	১৯৮৯-৯০ (ভিত্তিঃ১৯৭৩-৭৪=১০০)	১৯৯৪-৯৫ (ভিত্তিঃ১৯৮১-৮২=১০০)
সাধারণ সূচক	১৪০.৪০	১৬৫	২৬২
খাদ্যদ্রব্য, তামাক ও পানীয়	১১৩.২৭	২১২	১৫৩
বস্ত্র উৎপাদন (পাট ও সূতা)	১০৫.৯	১০৯	২৮৮
এর মধ্যে গার্মেন্টস	-	-	১৪৫৬৪
কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য	১৫৫.১৭	১৬৯	৩২৫
রাসায়নিক দ্রব্য	২৮৩.৮৪	৩৯৩	২৭৬

সূত্রঃ বিবিএস, ১৯৮৬,১৯৯০,১৯৯৬।

এই পুরো সময় জুড়ে বেসরকারী খাতের উৎপাদনশীল বিকাশ এবং বিদ্যমান সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণের তফাৎটি তাৎপর্যপূর্ণ। বেসরকারী খাতের বিকাশ ঘোষিত লক্ষ্য হলেও বরাবর সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণই মূল মনোযোগের বিষয় ছিল। প্রথমদিকে লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারী খাতে দিয়ে সরকারের ভর্তুকী কমানোর লক্ষ্য নির্দেশ করা হলেও ক্রমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণ করবার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ দেখা যায়। তাছাড়া, বহুমুখীকরণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে লাভজনক করবার সুযোগকে উপেক্ষা করে লোকসানের অজুহাতে পাটশিল্পকে বিলুপ্ত করবার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের আগ্রহ ও অর্থায়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই বিভিন্ন সরকার ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৭৪ থেকে ২৫ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি, রাষ্ট্রীয়করণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ উভয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন উত্তর ফলাফলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা আছে। রাষ্ট্রায়াত্ত ও বেসরকারী উভয়খাতে তাই আমরা একই ভাবে ক্ষমতার অব্যবহার, অ-বহুমুখীকরণ, রাষ্ট্রীয় ভর্তুকীর উপর নির্ভরশীলতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে পশ্চাৎপদতা দেখতে পাই। ১৯৯১ সালে গঠিত টাস্ক ফোর্স রিপোর্টে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, "শিল্পে রুগ্নতা যা এখন প্রায় শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি অব্যাহত আছে। ঋণদানকারী সংস্থার টাকা অনেকেই পরিশোধ করছে না, কিন্তু এর ফলে ঋণের যে সংকোচন হচ্ছে তাতে ক্ষতিগস্থ হচ্ছে প্রকৃত শিল্পপতিরা। চোরাচালানী এখন ব্যবসার চাইতে বেশি লাভজনক, এবং ব্যবসা শিল্পের চাইতে বেশি লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প থেকে সম্পদ স্থানান্তরিত হচ্ছে ব্যবসা ও অন্যান্য খাতে, ফলে দীর্ঘমেয়াদে শিল্পায়নের আশা একটা মায়া হয়ে দাঁড়িয়েছে" (টাস্কফোর্স, খন্ড১)।

সরকারী খাতে যেসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল এবং আছে সেগুলোতে লুটপাট ও লোকসান সম্পর্কে সকল সরকারের এবং বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য অভিন্ন। নীতি-নির্ধারণকারী অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরও সব সময়ই এ ব্যাপারে ঐকমত্য দেখা যায়। সকলের বক্তব্যেই এসব সংস্থাসমূহ বেসরকারী খাতে যতদ্রুত দিয়ে দেবার ব্যাপারেও অভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখা যায়। কিন্তু যে বক্তব্য এদের কারও কাছ থেকে পাওয়া যায় না সেটি হল এসব সংস্থার লোকসান-লুটপাট- অদক্ষতার কারণ অনুসন্ধান এবং এই লোকসানের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য কারণ চিহ্নিত করা। কোনরকম পর্যালোচনাহীনভাবে বেসরকারীকরণ যে কোন নতুন গতি সৃষ্টি করতে পারেনি বরঞ্চ "সোনার" ডিমের হাঁসের ভূমিকা পালন করে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান যে বন্ধ হয়ে গেছে তার কারণও তাই সহজেই বোধগম্য।

সারণী-৩। শিল্পখাতে ক্ষমতা ব্যবহারের মাত্রা

ব্যবহারের মাত্রা	০-২৫%	২৬-৫০%	৫১-৭৫%	৭৬-১০০%	১০১-১৫০%
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০৪২	৫৩৬৪	৯১৮৭	৭৩৬৬	-
শতকরা হার (%)	৪.৪৯	২৩.১৪	৩৯.৭৬	৩১.৬৭	১.০১

সুত্র ঃ বিশ্বব্যাংক ও ইউএসআইডি, ১৯৯৬

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানায় প্রায় ৩ দশকে প্রযুক্তিগত কোন বিকাশ ঘটানো হয়নি, নতুন পুঁজি বিনিয়োগও হয়নি। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার তুলনায় তার ব্যবহার হয়েছে কম। তার ফলে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে লোকসান প্রায় নিয়মিত ঘটনা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে এই লোকসানের পরিমাণ ৫৫২.১৮ কোটি টাকা অন্যদিকে ৩০ জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত এসব সংস্থা থেকে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের সংখ্যা ৭১,৮৮৭ জন। ১৯৯৮-৯৯ সালে লোকসান ১২০০ কোটি টাকারও বেশী। অন্যদিকে এরমধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বেকার ও ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের সংখ্যা লক্ষ অতিক্রম করেছে।

বিরাষ্ট্রীয়করণের ব্যাপারে উন্মাদনা বা অস্থিরতা এই পর্যায়ে গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিয়মকানুনও রক্ষা করা হয়নি, প্রকৃত দামের চাইতে অনেক কম দামে এবং উপরন্তু সরকারী নানা সুবিধা দিয়ে এগুলো ব্যক্তি মালিকানায় দেয়া হয়েছে যে তাকে বিলিয়ে দেয়া বা হরিলুট বলা অত্যুক্তি হবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, "২৯টি পাটকল যার দাম বিজেএমসির হিসেবে ২৪৫ কোটি টাকা তা ব্যাক্তমালিকানায় দেয়া হয়েছে মাত্র ৫.৫ কোটি টাকায়" (আবদুল্লাহ, ১৯৯১ঃ ২৮-২৯)। এরকম সম্পদ স্থানান্তরের পরিণাম হিসেবে যে বেসরকারী খাত দাঁড়িয়েছে তা প্রথম থেকেই বিকলাঙ্গ এবং শিল্পবিদ্বেষী। বিরাষ্ট্রীয়কৃত প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোই পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। টাস্কফোর্স রিপোর্ট অনুযায়ী ৮০ দশকে "যখন বাণিজ্য ও সেবায় বিনিয়োগের তুলনায় বেসরকারী শিল্পখাতে বিনিয়োগ ৪ গুণ হবার কথা বলা হয়েছে তখন বাস্তবে ঘটেছে ঠিক উল্টোটি" (পূর্বোক্ত)। ৭০ দশকের শেষ থেকেই শিল্পখাতের গঠনের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। পুরনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। সরকার এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকে। কোন প্রযুক্তিগত বা ব্যবস্থাপনাগত বিকাশ ঘটেনি, পুরনো প্রযুক্তি-পুরনো ব্যবস্থাপনা-বৈচিত্র্যকরণের অভাব-অনিশ্চয়তা-লুটপাট সবমিলিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বসে পড়তে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে অর্থনীতির উপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে থাকে। বিভিন্ন সরকার ও বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বোঝা হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি নিয়ে যতটা উচ্চ কণ্ঠ থেকেছে ততটাই নীরব থেকেছে এর কারণ সম্পর্কে। তার ফলে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেগুলো ব্যক্তি মালিকানায় গেছে সেগুলো মালিকদের সরকারী নানা সুবিধা দান করলেও কিংবা সেগুলোর সুবাদে ব্যাংকঋণের উদার সুবিধা পেয়ে মালিকরা স্ফীত হলেও অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান একই ধরনের বিপর্যস্ত পরিণতি লাভ করে।

শিল্পখাতে সরকারী ভূমিকা বেসরকারী পর্যায়েও বিনিয়োগের ধরন ও গতিমুখের উপর প্রভাব ফেলে। শিল্পের চাইতে বাণিজ্য ও সেবা এবং শিল্পখাতের মধ্যে রফতানীমুখী-হালকা প্রযুক্তিনির্ভর-শ্রমনির্ভর-ঠিকাদারী ধাঁচের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দিকে বিনিয়োগ বেশী হয়। এর ফলে একদিকে পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, ষ্টিল শিল্পগুলোর ক্ষয় দেখা যায় এবং বিকাশ দেখা যায় গার্মেন্টস, ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের। সেজন্য এসব শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার গড় প্রবৃদ্ধির হারের চাইতে বেশী। ১৯৯৪-৯৫ সালে সমগ্র শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.২% কিন্তু গার্মেন্টস হিসাব থেকে বাদ দিলে হার গাঁড়ায় ৮.৩% (সিপিডি, ১৯৯৫ঃ১৯৫)।

শিল্পে মূলধনের চাহিদার দিক বোঝার জন্য শিল্পে ব্যাংকঋণ বিবেচনা করা যায়, সেটা বিবেচনা করলে গত ২০ বছরে শিল্পে বিনিয়োগ এবং তার প্রসার অনেক বেশি হবার কথা। একদিকে মূলধনের এই সরবরাহ এবং অন্যদিকে পুরনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের রুগ্নদশা ও নতুন শিল্পখাতে শ্লথ বিনিয়োগ মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া শিল্পে বিনিয়োগ বাড়লে যন্ত্রপাতি আমদানি, বিদ্যুৎ ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যেও তার প্রভাব পড়বার কথা। আগে তো বটেই, ৯০ দশকের প্রথম দিকেও এসব ক্ষেত্রে কোন সঙ্গতিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়নি(সিপিডি, ১৯৯৫)।

পাশাপশি রাজধানীর প্রান্ত বা শহরতলীতে এবং থানা শহরগুলোতে এমন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এবং নগরায়নের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর বিস্তারও ঘটেছে যেগুলোতে পুঁজির অনুপাত কম, আমদানিকৃত প্রযুক্তির ব্যবহার কম এবং সাধারণতঃ পারিবারিকভাবে এখানে কাজ হয়, ব্যবস্থাপনাও সেভাবে গঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও দেশেরই প্রায় একই ধরনের শিল্পে তৈরী। এরকম অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো আইনবহির্ভূত, জিডিপির হিসাব বহির্ভূত। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ দেশীয় বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করে থাকে, এগুলো সবচাইতে বেশি সৃজনশীলতা ও গতিশীলতার পরিচয় দিলেও সরকারী আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার নানা ব্যবস্থার বাইরে। ব্যাংকঋণ, কর মওকুফ, অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি কোন কিছুই এরা পায় না। এসব প্রতিষ্ঠানে যুক্ত শ্রমশক্তির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অধীনে আমদানি অবাধকরণে এদের লাভ নেই, কারণ এরা আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা কাঁচামাল খুবই কম ব্যবহার করে, বরঞ্চ আমদানি অবাধ হওয়াতে তাদের অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। আবার মুদ্রা অবমূল্যায়নে রপতানিমুখী প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভ হয় কিন্তু এদের তাতে লাভ নেই, কেননা এরা রফতানির জন্য উৎপাদন করে না। বরঞ্চ মুদ্রা অবমূল্যায়নে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাবার ফলে এদের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়।

বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রদত্ত সুবিধাদি ক্রমে অনেক বিস্তৃত করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল খোলা শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে এই অঞ্চলই শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে বিদেশী বিনিয়োগের গতিমুখ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মোট বিনিয়োজিত বিদেশী বিনিয়োগের শতকরা ২৩.৭৬ ভাগ শিল্পখাতে গেছে, শতকরা ৬৯.১১ ভাগ গেছে ব্যবসায়। এখানে যে বিনিয়োগ হয়েছে তার বেশিরভাগই এক্ষেত্রে পূর্বে পুঁজি থেকে প্রাপ্ত আয় থেকেই করা হয়েছে। নীট মুদ্রা পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ বা মূলধনী দ্রব্যাদি আমদানি হয়েছে খুবই কম, মাত্র ১২.৮% (বাংলাদেশ ব্যাংক, ১৯৯০; রেজা,১৯৯৫)।

গত কয়েক বছরে শিল্পখাতে বিনিয়োগের একক বৃহৎ এবং বিদেশী বিনিয়োগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাফকোতে বিনিয়োগ। সামগ্রিকভাবে রফতানি অঞ্চলও এর পরে। অবশ্য রফতানি অঞ্চলে বিনিয়োগকে ছাড়িয়ে গেছে স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ। কয়েক বছরের প্রবণতা থেকে এ ধারণা করা যায় যে, এই খাতটিই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবিচিত। ২৫ বছরের শেষ পর্যায়ে শেয়ার বাজার নিয়ে যে তুলকালাম কান্ড হয়েছে এবং যা এক পর্যায়ে গিয়ে ক্রাশের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে সর্বশান্ত করেছে সাময়িক তদন্তে তার পেছনে মূল ক্রিয়াশীল হিসেবে পাওয়া গেছে চারটি বিদেশী কোম্পানীকে (ভোরের কাগজ, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯৬)। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের দিয়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অল্প সময়ে বিপুল লাভ করে দেশ ত্যাগ করেছে। তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে বিপুল বিদেশী বিনিয়োগ ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু এই বিনিয়োগের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ প্রকৃতপক্ষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। উপরন্তু এই বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করলে এর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে, ক্ষতিকর-উৎপাদনবিরোধী দিকগুলো স্পষ্ট হবে।

বাণিজ্য

বাণিজ্য ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা উত্তর ২৫ বছরে পরিমাণগত ও গুণগত বেশকিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একরৈখিক ধারা অবশ্য এরমধ্যেও অব্যাহত থেকেছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ৪৩৫ কোটি টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ২০গুণেরও বেশি। আমদানি বাণিজ্যের গঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এ সময়ে দেখা যায়নি। ভোগ্যপণ্যের আধিক্য এখনও আমদানি তালিকায় প্রবল, তালিকার চাইতেও বাস্তবে তার অনুপাতে বেশি বলে ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে রপ্তানি আয়ের উৎসে পরিবর্তনসাধিত হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে 'সোনালী আঁশ' বলে কথিত পাটই ছিল রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস, এছাড়া অন্যান্য প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ইত্যাদি। ৮০ দশক থেকে এ পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং ক্রমান্বয়ে তৈরী পোশাক প্রধান রপ্তানি পণ্যে পরিণত হয়। ১৯৮০ সালে মোট রপ্তানির মধ্যে তৈরী পোশাকের অংশ ছিল শতকরা ২ ভাগ, ১৯৯৫ সাল নাগাদ এর অংশ হয়েছে শতকরা ৬১ ভাগ। অন্যদিকে পাট একই সময়কালে শতকরা ৬২ ভাগ থেকে নেমে ১২ ভাগে পৌঁছেছে। রপ্তানি পণ্যের মূলধারায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি অঞ্চলেও পরিবর্তন দেখা যায়। তৈরী পোষাকের মূল রপ্তানি অঞ্চল হচ্ছে ইউরোপীয়ান অঞ্চল (প্রায় ৯৫%)।

সারণী ৪। রপ্তানি বাণিজ্যের ধরন

(মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা হার)

রপ্তানি পণ্য	বছর			
	১৯৮২-৮৩	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৪-৯৫
তৈরী পোশাক	২	১৬	৪৩	৬১
চামড়া	৮	৭	৮	৭
হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি	১০	১৪	৮	১০
পাট ও পাটজাত দ্রব্য	৬২	৫৫	২৭	১২
চা	৭	৪	২	১
অন্যানা	১১	৪	১২	১০

সূত্র ঃ বিবিএস, ১৯৯৪; সিপিডি ১৯৯৫।

স্বাধীনতার পরপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ক্রমেই তা শিথিল হয়েছে। বর্তমানে মোট আমদানির শতকরা ৮১ ভাগ হয় সম্পূর্ণ বেসরকারী খাতে, অন্যদিকে রপ্তানির শতকরা ৯৭ ভাগ বেসরকারী খাতেই করা হয় (বিবিএস, ১৯৯৬)। বেসরকারী খাতে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও গত দুই দশকে একচেটিয়াকরণ হয়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। ১৯৮৫-৮৬ সালে মোট আমদানিকারকের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। দেশে বৃহৎ আকারের ইন্ডেন্টরের সংখ্যা মাত্র ৭৪ জন। আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য থেকে দেখা যায়, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের শতকরা ৮০ ভাগ ইন্ডেন্টিং ঠিকাদারীর দায়িত্ব পেয়েছে মাত্র ৬টি বড় ইন্ডেটিং ফার্ম (আব্দুল্লাহ, ১৯৯১ঃ৩১-৩৩)। শিথিল বা প্রত্যাহার করা হয়েছে আমদানি রপ্তানির উপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ। ১৯৮৫-৮৬ সালে পুরোপুরি নিষিদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত বা নানা রকম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল ৪৭৮টি বিষয়, ১৯৯৩-৯৮ সালের মধ্যে ৩৬৯টির উপর থেকে সবরকম নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হয়। সমগ্র অর্থনীতিতে ১৯৮৯ সালে সংরক্ষণ হার ছিল শতকরা ৯৪ ভাগ, ১৯৯৫ সালে তা

দাঁড়ায় শতকরা ৩০ ভাগ (ইলমাজ ও ভর্মা)। এর ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভোগ্যপণ্য আমদানির প্রবাহকে তা শক্তিশালী করেছে। নীচের সারণীতে আমদানি বাণিজ্যের কাঠামো থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে প্রথমতঃ ভোগ্যপণ্যই আমদানি বাণিজ্যের প্রধান অংশ এবং দ্বিতীয়তঃ এই আমদানির বৃদ্ধির হারও সবচাইতে বেশি।

সারণী ৫। আমদানি বাণিজ্যের ধরন (%)

আমদানি পণ্যের ধরন	বছর				হ্রাসবৃদ্ধি (%)
	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	
ভোগ্যপণ্য	১৭.৯	৩২.৮	৩৪.৭	৩৯.১৭	+১১৮.৮২
ভোগ্যপণ্যের দ্রব্যাদি	৪০.৩	৩৬.১	৩০.১	৩০.২৯	-২৪.৮৪
মূলধনী পণ্য	২৬.৯	১২.৩	১৪.৪	১২.৫৭	-৫৩.৩৮
মূলধনীপণ্যের দ্রব্যাদি	১৪.৯	১৮.৯	২০.৮	১৭.৯৭	+২০.৬০

সূত্রঃ বিবি এস. ১৯৯৪ থেকে তৈরী।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বেড়েছে। তবে আইনি বাণিজ্যের তুলনায় বেআইনি বাণিজ্যই বেড়েছে বেশি। ১৯৯৩-৯৪ সালের বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যের উপর এক গবেষণায় দেখা যায় আইনি ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি যেখানে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা ছিল সেখানে বেআইনি বাণিজ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ২০০০ কোটি টাকা (সারণী ৬)।

সারণী ৬। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য, ১৯৯৩-৯৪

বিষয়	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
আইনি আমদানি	১৬৬০.২৬
আইনি রপ্তানি	৮৪.৪২
আইনি বাণিজ্য ঘাটতি	১৫৭৫.৮৫
বেআইনি আমদানি (বেআইনি রাস্তা)	২০৮৬.৩৮
বেআইনি আমদানি (আেইনি রাস্তা)	৪১৪.১৬
মোট বেআইনি আমদানি	২৫০০.৪৪
বেআইনি রপ্তানি	৫০৬.৫২
বেআইনি বাণিজ্য ঘাটতি	১৯৯৩.৯২
ভারতের সঙ্গে মোট বাণিজ্য ঘাটতি	৩৫৬৯.৭৬

সূত্রঃ বখত, ১৯৯৬।

বিদেশী 'সাহায্য'

স্বাধীনতার ঠিক পরপর বিদেশী 'সাহায্য' তহবিল যোগানের উপর নির্ভরশীলতা বিরোধী যে মেজাজ সমাজে এমনকি সরকারের মধ্যে শক্তিশালী ছিল তা অন্ততঃ সরকারী মহলে কেটে যেতে সময় লাগেনি। বাংলাদেশ খুব দ্রুত 'বিদেশী সাহায্য' নামের আন্তর্জাতিক জালে আটকে গেছে। ক্রমান্বয়ে এটি সমাজে একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই বিদেশী 'সাহায্যে'র প্রবাহ শুধু যে আমদানি বাণিজ্যকে শক্তিশালী করেছে তাই নয়, বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিধারা গঠন ও দেশের ভেতর একটি অনুৎপাদক শাসক শ্রেণী এবং সমাজে ভিখিরী সংস্কৃতির বিস্তারেও মূল প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প 'সাহায্য' ছিল শতকরা ১৪.৫ ভাগ, ক্রমেই তার অনুপাত বেড়েছে; ১৯৭৪-৭৫ এর শতকরা ১৫.৮৭ ভাগ বেড়ে ১৯৮৫-৮৬ তে দাঁড়ায় ৫৪.৪১ ভাগ এবং ১৯৯৩-৯৪ তে পৌছায় ৬৩.৬ ভাগে। ১৯৯৭ সালে এটি উঠেছে শতকরা ৭৫ ভাগে। ১৯৭২-৭৩ সালে বিদেশী 'সাহায্যের' পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলার, ১৯৯৫-৯৬ সালে তা উঠেছে ১৫৮ কোটি ডলারে। গত ২৫ বছরে এদেশে প্রবাহিত (অবমুক্ত) বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ৩০৬৩ কোটি ডলার বা প্রায় ১,২৩,১২৩ কোটি টাকা যা বর্তমানে এক বছরের জাতীয় আয়ের প্রায় সমান।

বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্যের সুফলভোগীদের চিহ্নিত করতে গিয়ে এক গবেষণায় দেখে গেছে যে, বিদেশী 'সাহায্য' যা আসে তার শতকরা ৮০ ভাগ বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি এবং তাদের কনসালট্যান্টদের পেছনেই ব্যয় হয়; বাকী ২০ ভাগের ১৫ ভাগ স্থানীয় আমদানিকারক, ইন্ডেন্টর আর এর সঙ্গে সম্পর্কিত সামরিক-বেসামরিক আমলাদের জন্য ব্যয় হয় (সোবহান, ১৯৯২)। এই প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে বিদেশী তহবিল বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে বহুসংখ্যক অনুৎপাদক-কোটিপতি সৃষ্টির সম্পর্ক বুঝতে অসুবিধা হয় না। একটা সহজ হিসাব এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এ পর্যন্ত এদেশে বিদেশী 'সাহায্য' এসেছে প্রায় ১,২৩,১২৩ কোটি টাকা। এই টাকা মূখ্যত আমদানি বাবদই ব্যয় হয়েছে। আমদানি কমিশন ২ শতাংশ ধরলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৬২ কোটি টাকা। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কমিশন আরও বেশি এবং এগুলো ভাগ হয় সামরিক-বেসামরিক আমলা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। আর এই পুরো সাহায্য সাম্রাজ্যের অন্যতম সুফলভোগী বিশেষজ্ঞরাও, যাঁরা মেধার দিক থেকে অনেক উচ্চতর অবস্থানে থেকেও অনেক নিম্নস্তরের সাহায্য-ডিলারের কনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে ঠিকাদারী গবেষণা করেন।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত

স্বাধীনতার পর এত বছরেও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার ভৌত অবকাঠামো দাঁড়ায়নি। গত কয়েক বছর থেকে রেডিও-টিভিতে শিশুদের স্কুলে যাবার জন্য ডাক দেয়া হলেও তাদের পড়ানোর মতো স্কুল-বেঞ্চ-শিক্ষক-বইপত্রের ব্যবস্থা হয়নি। একই পদ্ধতির শিক্ষার পরিবর্তে সমাজে শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির মেরুকরণের সংগে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বহু পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে, স্বচ্ছল পরিবারের জন্য বেসরকারী ব্যয় বহুল শিক্ষা, মধ্য ও নিম্নবিত্তের জন্য সরকারী শিক্ষা এবং দরিদ্রদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে শিক্ষার মান, কর্মবাজারে সুযোগ ইত্যাদিতে ব্যবধান আকাশ পাতাল। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয়র পরিমাণগত অনুপাত কিংবা গুণগত বিকাশ কোনটিই ঘটেনি। ১৯৭২ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল রাজস্ব ব্যয়ের ২১.১৪%, এই অনুপাতে ব্যয় এখনও ফিরে আসেনি। ১৯৭৩ সালে থেকে এটা কমতে থাকে এবং সামরিক খাতের ৯.৪৬% ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এখন দুটো প্রায় সমান সমান। প্রকৃত ব্যয় হিসাব করলে শিক্ষাখাতে ব্যয় আরও কমেছে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

সারণী ৭। রাজস্ব ব্যয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত

বছর	মোট রাজস্ব ব্যয়	শিক্ষাখাতে ব্যয়	%	প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	%	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে ব্যয়	%
১৯৭২-৭৩	২১৩.১১	৪৫.০৬	২১.১৪	২০.১৬	৯.৪৬	১১.১৪	৫.২৩
১৯৭৩-৭৪	৩৪৬.২	৬৪.৮২	১৮.৭২	৪১.৯৬	১২.১২	১৪.৩৯	৪.১৬
১৯৭৬-৭৭	৬৭৯.৩১	৯৮.২১	১২.৭৬	১৫১.৩৯	১৯.৬৮	৩০.২৯	৩.৯৪
১৯৮১-৮২	১৮৪৯.৬৮	২৩১.৬৪	১২.৫২	৩৪৭..৫৬	১৮.৭৯	৮৭.২০	৪.৭১
১৯৮৮-৮৯	৬১৭০	৯৪৮	১৫.৩৬	১০১৫	১৬.৪৫	৩২১.১৩	৫.২০
১৯৯০-৯১	৭৩১০	১১৮২	১৬.১৭	১১৮০	১৬.১৪	৩৮৬.৯	৫.০
১৯৯১-৯২	৭৯০০	১৩৮২	১৭.৪৯	১৩০১	১৬.৪৭	৪৩১	৫.০
১৯৯৪-৯৫	১০৩০০	২০০৮	১৯.৪৯	১৮৮৭	১৮.৩২	৬৮৫	৬.৬৫
১৯৯৫-৯৬	১১৮১৪	২১৪৮	১৮.১৮	২০৬৯	১৭.৫১	৭৩০	৬.১৮
১৯৯৬-৯৭	১২১০৩	২২৩৩.২৮	১৮.৪৫	২২১৫.৮৮	১৮.৩১	৭৪৮.৪৮	৬.১৮

সূত্রঃ বিবিএস, ১৯৮৬,১৯৯২,১৯৯৬ ; বাজেট বক্তৃতা,১৯৯৬।

শিক্ষাখাত বলে যে খাতটির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সেটি বস্তুতঃ শিক্ষা ও ধর্ম খাত। তারপরও এই যুক্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ সামরিক খাতের তুলনায় বেড়েছে অনেক কম। এই খাতে ৯৫-৯৬ সালে বরাদ্দ ছিল ২১৪৮.০৩ কোটি টাকা, ৯৬-৯৭ সালে এক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে ৮৫.২৫ কোটি টাকা, দাঁড়িয়েছে ২২৩৩.২৮ কোটি টাকায়। বৃদ্ধির হার ৪.১১%। মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করলে প্রকৃত বরাদ্দ কমেছে। অন্যদিকে ৯৬-৯৭ সালের বাজেটেও সামরিক খাতে বরাদ্দ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি, যদিও এবার এখাতেই রাজস্ব বাজেটে ব্যয় সবচাইতে বেশি বাড়ানো হয়েছে। আগের বছর মূল বাজেটে এখাতে ব্যয় ছিল ১৯৩৪.৬৭ কোটি টাকা, পরের বছর তা ২৮১.২১ কোটি টাকা বড়িয়ে করা হয়েছে ২২১৫.৮৮ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৪.৫৩%।

সারণী ৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ ১৯৭২-৯৫

স্তর	১৯৭২	১৯৮০	১৯৯০	১৯৯৫	মোট বৃদ্ধির হার % (৭২-৯৫)
প্রাথমিক (সরকারী ও বেসরকারী)	৩৬,৫৪৭	৪৩,৯৩৬	৪৫,৯৩৬	৬০,২৯২	৬৫%
মাধ্যমিক	৭,৭১৭	৮,৪৮৫	১০,৪৪৮	১১,৭৫৯	৫২%
দাখিল	৫২৮	১,৪০২	৪,৩০৬	৪,০৫২	৬৬৭%
সাধারণ কলেজ	৫৩১	৫৮১	৮৪৮	১,১২৫	১১২%
বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৬	৮	১৮	২০০%

সূত্র ঃ BANBEIS ও বিবিএস-এর বিভিন্ন বছর। উদ্ধৃতিঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতীঃ আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ঢাকা, ১৯৯৬।

১৯৯৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিয়ে সরকারী দলিলপত্রে বেশ স্ববিরোধিতা আছে। যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৬-এ বলা হয়েছে এই সময়ে উপরের সারণীর সংখ্যাই, ৬০,০০০। কিন্তু বিবিএস-এর স্ট্যাটিষ্টিক্যাল পকেট বুক, ১৯৯৫-এ ১৯৯৪ এর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেখানো হয়েছে প্রায় ৯৬,০০০। তবে সব হিসাব থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃদ্ধি বেসরকারী খাতেই ঘটেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৮,০০০; ১৯৯৫ সালেও এই সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। অন্যদিকে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৯০ সালে ছিল ৯ হাজার, ১৯৯৫ সালে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার। এর মধ্যে ব্যবসায়ী ও এনজিও উভয় উদ্যোগই অন্তর্ভুক্ত।

সারণী ৯। শিক্ষার নানা স্তরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি, ১৯৭২-৯৫

(শিক্ষার্থী সংখ্যা, লক্ষ)

শিক্ষার স্তর	বছর				গড় বার্ষিক বৃদ্ধি	মোট কতগুণ বৃদ্ধি (৭২-৯৫)
	১৯৭২	১৯৮০	১৯৯০	১৯৯৫		
প্রাথমিক	৭৭.৯৪	৮২.১৯	১১৯.৪০	১৫৩.৯২	৩.০০	১.৯৭
মাধ্যমিক	১৮.৩৪	২১.৪২	২৯.৯৪	৪৭.৮৪	৪.২৬	২.৬১
দাখিল মাদ্রাসা	০.৯৫	১.২৪	৬.১৫	১১.৫২	১১.৪৬	১২.১৩
সাধারণ কলেজ	৩.৮৫	৩.৩৪	৮.২৪	১২.০৮	৫.১০	৩.১৪
বিশ্ববিদ্যালয়	০.২৬	০.৩৭	০.৫২	০.৭৬	৪.৭৭	২.৯২

সূত্র ঃ BANBEIS ও বিবিএস-এর বিভিন্ন বছর। উদ্ধৃতিঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতীঃ আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ঢাকা,১৯৯৬।

শিক্ষাখাতে ব্যয়ের গুণগত দিকের ফলাফল হলো স্কুলের চাইতে মাদ্রাসার বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মাদ্রাসায় মাথাপিছু ছাত্রের পেছনে স্কুলের তুলনায় অধিক ব্যয়।

সারণী ১০। শিক্ষাখাতে মাথাপিছু সরকারী ব্যয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্রছাত্রী মাথাপিছু ব্যয় (টাকা)
সরকারী মাধ্যমিক স্কুল	২৯৯৭
বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল	৮৪৩
সরকারী কলেজ	২৭৪৪
বেসরকারী কলেজ	১৪৩৫
সরকারী মাদ্রাসা	৪৯৮৫
বেসরকারী মাদ্রাসা	১০৬২
বিশ্ববিদ্যালয়	২৪,৬০২

সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,১৯৯৬

স্বাস্থ্যখাতটিও একটি যুক্তখাত। এর মধ্যে 'পরিবার পরিকল্পনা' (বর্তমানে পরিবার কল্যাণ কথিত) বিষয় ব্যয়ও ধরা হয়- এই অংশটিতে যেহেতু তথাকথিত বিদেশী সাহায্য বেশি আসে সেহেতু এই বরাদ্দই এই যুক্তখাতের চেহারা গঠন করে যার মধ্যে বরাবরই খুব শীর্ণ অবস্থায় থাকে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি বছরের (১৯৯৬-৯৭) বাজেটের কথা বলা যায়। যেসব

খাতে ১৯৯৬-৯৭ সালের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ কমেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, বন্যা ও পানি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা, যুক্তভাবে শিক্ষা ও ধর্ম এবং স্বাস্থ্য, শ্রম ও জনশক্তি। সবচাইতে বেশি হারে কমেছে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা, ৬১ কোটি টাকা থেকে ২৭.৫০ কোটি টাকা-হ্রাসের হার ৫৪.৯২%, এরপরই হলো শিক্ষা ১৬০৫.২৯ কোটি টাকা থেকে ১৪০২.৪৩ কোটি টাকা, কমেছে ২০২.৮৬ কোটি টাকা-হ্রাসের হার ১২.৬৩%। নতুন উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দের অনুপাতে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। ১২,৫০০ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটে (১৯৯৭-৯৮) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা বাবদ ধরা হয়েছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা। এখাতে এই তুচ্ছ ব্যয়বরাদ্দ এবং তারও আবার ৫০ শতাংশেরও বেশি বছর শেষে কেটে নেয়া খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৯৮-৯৯ পর্যন্তও এই ধরনের কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি।

দারিদ্র ও দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশে ৬০ দশকের কুমিল্লা মডেল ইত্যাদির ধারাবাহিকতায় ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে দারিদ্র-বিমোচন কর্মসূচী অনেক জোরদার হয়েছে। এ সম্পর্কিত সরকারী সংস্থাগুলোর রিপোর্ট দেখলে যে কেউ সঙ্গত কারণেই ভাবতে পারেন যে, অগ্রগতি খুবই বিশাল। কিন্তু খটকা লাগার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘোরার দরকার হয়না; ঢাকা শহরে একটু বেরুলেই যে কোন স্বাভাবিক মানুষের মাথায় প্রশ্ন আসবে যে, ৩৫ বছর ধরে দারিদ্র বিমোচনের পর এবং গ্রামাঞ্চল জুড়ে হাজার হাজার সংস্থার এত 'সাফল্যের' পরও ঢাকা শহরে মানুষের এই প্রবাহ কেন? ঢাকার ফুটপাতেই লক্ষ মানুষ যদি থাকে দারিদ্র তাহলে কি বিমোচন হচ্ছে হাজার কোটি টাকা খরচ করে? বাংলাদেশে এত গবেষণা হচ্ছে তারপরও তথ্যভিত্তি বলতে যা বোঝায় তার কোন ভাল অবস্থা এখানে তৈরী হয়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংগৃহীত তথ্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এই ব্যুরো থেকে বিভিন্ন বছরে পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত যে জরীপ করা হয় সেটা থেকেই দারিদ্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে, একই তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফলাফল নিয়ে আসে। দারিদ্র রেখা নির্ধারণ, দারিদ্রের সংজ্ঞা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই কারণে বিস্তর তফাৎ দেখা যায়।

ক্যালরী পদ্ধতিতে হিসাব করলে ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র সীমার নীচে মোট জনসংখ্যা ছিল ৫কোটি ৮৩ লাখ, ৮ বছরের বিমোচন কর্মসূচীর পর তা কমে হয়েছে ৫ কোটি ১৬ লাখ, এই হিসেবে ৮ বছরে কমেছে প্রায় ৭০ লাখ, বছরে ৯ লাখের মত (বিবিএস, Household Expenditure Survey 1990-91)। কিন্তু এই পদ্ধতি অনেকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। বিশ্বব্যাংকের

দফতরে সেন ও রেভেলিয়েন এ সংক্রান্ত গবেষণায় অন্য এক পদ্ধতিতে হিসাব করে দেখেছেন ৮ বছরে কমে আসা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৫ লাখের বেশি নয়, সেই হিসেবে বছরে কমেছে মাত্র ২ লাখ। অথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা মোট ৫৩.০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে ছিল, ৮ বছর অনেক প্রতিষ্ঠানিক ঋণ কর্মসূচী ও দারিদ্র বিমোচনের অনেক 'আন্তরিক প্রয়াসের' পর তা কমে হয়েছে শতকরা ৫২.৯ ভাগ।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিস্থিতির যে হিসাব পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে একটি সারসংক্ষেপ ও উন্নয়ন মাত্রার হিসাব দেখানো হয়েছে পরের সারণীতে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ক্যালোরী পদ্ধতিতে হিসাব করলে বর্তমান ব্যবস্থা চলতে থাকলে দারিদ্র বিমোচনে সময় লাগবে প্রায় ৭০ বছর। উন্নততর পদ্ধতিতে হিসাব করলে এই কাজে লাগবে ৩১৩ বছর; একই পদ্ধতিতে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে সময় লাগবে ৯০৯ বছরেরও বেশী, অর্থাৎ প্রায় ১০০০ বছরের কর্মসূচী!!

১৯৯৫-৯৬ সালের যে পারিবারিক ব্যয় জরীপ প্রকাশিত হয়েছে তাতে উপরের প্রবণতার কোন পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ জরীপের ফলাফল পরিস্থিতির অবনতিই নির্দেশ করে। ৯০ দশকের প্রথমার্ধে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪ ভাগের বেশি। দ্বিতীয়ার্ধে এটি ৫ ভাগেরও বেশী। যেসময় জিডিপি রয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ, সেসময়ে দারিদ্র কমেছে শতকরা ২ ভাগের কম।

সারণী ১১। ' দারিদ্র' উন্নয়নের মাত্রা

বিষয়	মৌলিক চাহিদা পদ্ধতি	ক্যালোরী গ্রহণ পদ্ধতি
বছরে 'দারিদ্ররেখার' উপরে উঠা মানুষের শতকরা হার		
গ্রাম	০.১১%	১.৫৩%
শহর	০.৯১%	০.৮২%
জাতীয়	০.৩২%	১.৪৪%
এই হিসাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য কত বছর প্রয়োজন ।		
গ্রাম	৯০৯.০৯	৬৫.৩৬
শহর	১০৯.৮৯	১২১.৯৫
জাতীয়	৩১২.৫	৬৯.৪৪

দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কথাবার্তা থেকে এটা মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশের মানুষ নিজেরা উদ্যোগহীন এবং সমাজের মধ্যে কর্মসংস্থান

সৃষ্টির আর কোন প্রক্রিয়া জারী নেই। হাজার হাজার বছর ধরে যে মানুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে বৈরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন তাঁরা এনজিওর কথা শুনে বা কিছু ঋণ পেয়ে তারপর নানা কাজ কর্মে হাত দিয়েছেন এটাও ইতিহাস ও জনগণের বাস্তব জীবনে অব্যাহত প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করবারই শামিল। সরকারের তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, গ্রাম ও থানা পর্যায়ে গত ১০ বছরে বহু ধরনের অকৃষি অর্থনৈতিক তৎপরতা বিকশিত হয়েছে যার অনেকগুলোই সরকার বা এনজিও কোন দিক থেকেই অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়। ঢাকা শহরে রিক্সাসহ পরিবহনের বিভিন্ন খাতে ২০ লক্ষ মানুষ জড়িত হয়েছেন গত ১০ বছরে। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন ছোট বড় শিল্প খাতে জড়িত হয়েছেন প্রায় ১৪ লক্ষ। তারপরও দারিদ্র বিমোচনের "সাফল্যের" সংখ্যা হলো ১৫ লাখের।

দারিদ্র বিমোচনের নামে বরাবর যে বরাদ্দ থাকে তার বৃহৎ অংশ আমলা-দেশী বিদেশী গবেষক-এনজিও কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দারিদ্র ব্যবসায়ীদের স্ফীত হবার কাজেই লাগে বেশি। এবং দারিদ্র টিকিয়ে রাখা ও সৃষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থাবলীর পেছনে এর চাইতে অনেক বেশী বরাদ্দ থাকে। সেই প্রক্রিয়ার জোরও তুলনায় অনেক বেশি। ফলে সঙ্গত কারণেই দারিদ্র বিমোচনের নামে বিভিন্ন বরাদ্দ অনেক মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করলেও দারিদ্র নিরসন তো দূরের কথা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় তা হ্রাসও করতে সক্ষম হয়না। সরকারী দলিলপত্র থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সে কারণেই স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা ছিল প্রায় সে সংখ্যক মানুষই এখন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন। উপরন্তু বহুবিধ দারিদ্র বিমোচনের ঢাকঢোল সত্ত্বেও শহরগুলোতে বিশেষতঃ ঢাকা শহরে ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমজীবী মানুষের আগমনও এসব কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত সারহীনতারই বহিঃপ্রকাশ। এটা খেয়াল করবার বিষয় যে, বস্তুতঃ যে সব দেশে, পুঁজিবাদী বা বিপ্লবউত্তর সমাজে, দারিদ্র নিরসন বা হ্রাস উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘটেছে তার কোথাও তা তথাকথিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী দিয়ে ঘটেনি, ঘটেছে সামগ্রীক উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

কালো অর্থনীতি

বাংলাদেশে একক শক্তিশালী খাত হিসেবে যেটিকে এখন অভিহিত করা চলে সেটিকে আবার বিভিন্ন উপভাগে বিভক্ত করা যায়, এগুলো হলঃ গোপন, কালো, মাস্তান অর্থনীতি। পরোক্ষ প্রভাব থাকলেও জিডিপিতে এর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি

হিসাবের ব্যবস্থা নেই। এই অর্থনীতির সীমা এবং তার সরল ও যৌগিক, সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা এখনও হয়নি। তবে এটি আন্দাজ করা যায় যে, দেশের বিনিয়োগ, আয়-উপার্জন, কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে এই খাতের একটি বড় ভূমিকা আছে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি অনেক সিদ্ধান্তের পেছনেও এই খাতের ক্রিয়াশীল অর্থ ও লোকবলের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। অস্ত্র, মাদকদ্রব্য এই খাতের অন্যতম অংশ। স্বাধীনতার পর দেশে অর্থনৈতিক তৎপরতার যে ধরন সবচাইতে বেশি শক্তিশালী হয়েছে তা আইনী নেটওয়ার্ক বহির্ভূত এই অর্থনীতিকেই পুষ্ট করেছে বেশি। সাহায্য নির্ভর আমদানী-রপ্তানি, তথাকথিত সিস্টেম লস, ঘুষ, ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ, কর ফাঁকি, বেআইনী ব্যবসা ইত্যাদি এই অর্থনীতির জীবনীশক্তি। এই অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, মুনাফা ইত্যাদি কোন কিছুই সরকারী হিসাবের মধ্যে নেই। কিন্তু এই অর্থনীতিতে নিয়োজিত আছেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। এরকম ধারণারও যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, দেশে গত প্রায় ৩ দশকে যে বিপুল বিত্তের অধিকারী একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তাদের সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধির পেছনে এই অর্থনীতির একটি বড় ভূমিকা আছে।

ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত এই সম্প্রদায়ের উপর পরিচালিত একটি গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই সম্পদায়ের বিত্ত গঠনে উল্লেখযোগ্য পথগুলো হচ্ছে, "(ক) সরকারী ক্ষমতা কব্জা করে পরিত্যক্ত বা সাধারণ সম্প্রত্তি দখল, সরকারী সম্পদ হস্তগত করা, চুরি, জালিয়াতি; (খ) চোরাচালানী, মাদকদ্রব্য ব্যবসা, মজুদদারী, কালোবাজারী, মুদ্রা ব্যবসা, হুন্ডি, আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিং (গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিপুল অংকের ঋণ নিয়ে তা মেরে দেয়া বা আমদানী-কমিশন; (ঘ) সরকারী বিধিনিষেধ, নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, পারমিট ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি" (সিদ্দিকী প্রমুখ ১৯৯০ঃ ১৯২)। একটি খসড়া ও অসম্পূর্ণ হিসাবে আসাদুজ্জামান দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে জিডিপির শতকরা প্রায় ২০ ভাগের সমান সম্পদের কোন খবর নেই (আসাদুজ্জামান, ১৯৯৫)। ১৯৭২-৭৩ এ এরকম অর্থের পরিমাণ ছিল ১০১৩.৮২ কোটি টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে একই হার ধরলে এ অংক প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা। কোন কোন ভাষ্য অনুযায়ী দেশে কালো টাকার পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

নারী

অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ পরিবারের সদস্যদের খোরপোষের চিন্তা করা ও ঘাটতি পূরণের জন্য নিজের শ্রমশক্তি কাজে লাগানো ইত্যাদি এদেশে অনেক কাল থেকেই চলে আসছে। বস্তুতঃ এ দেশের অর্থনীতির হিসাব নিকাশে সাধারণতঃ দৃশ্যমান সরাসরি উপার্জনমূলক কাজ, সে হিসেবে শুধু পুরুষের শ্রমই, বিবেচনা করা হয়েছে। এই হিসাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের আয় এতই কম যে, তাদের নিছক দৈহিকভাবে টিকে থাকারও ব্যাখ্যা করা কঠিন। এত কম আয় নিয়েও তারা কিভাবে টিকে আছেন সে রহস্যের কিনারা পাওয়া যায় এসব পরিবারের মেয়েদের কাজ বিবেচনা করলে। গ্রামের মেয়েরা সাধারণতঃ দুধরনের কাজ করেন-একটি হচ্ছে ব্যয় হ্রাসকরণের কাজ, অন্যটি হচ্ছে সরাসরি উপার্জনমূলক কাজ (যেমন- ঘরের পাশে সবজী চাষ, ধান, হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল পালন, কাঁথাসহ বিভিন্ন সেলাই, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঘরের বিভিন্ন কাজ, স্বল্প সঞ্চয় ইত্যাদি)।

শ্রমশক্তির পুরানো সংজ্ঞা অনুযায়ী এতে নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ, এখন সংজ্ঞা কিছুটা বাস্তবমুখী করায় শ্রমশক্তিতে নারীর সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে (বিবিএস, ১৯৯৫)। নারীর গার্হস্থ্যকাজকে হিসাবে নিলে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সন্দেহ নেই তা পুরুষের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। হিসাবের এই পুনর্বিন্যাস জিডিপির ক্ষেত্রেও দরকার যেখানে নারীর শ্রম হয় অনুল্লেখ্য থাকে নয়তো অন্য কিছুর আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। শামীম হামিদ এবিষয়টি অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন, প্রচলিত পদ্ধতির হিসাবে মোট জিডিপির মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ পুরুষের শ্রম এবং শতকরা ২৫ ভাগ নারীর শ্রম। কিন্তু বাজার-বহির্ভূত কাজকে হিসাবের মধ্যে নিলে নারীর অবদান দাঁড়ায় শতকরা ৪১ ভাগ এবং পুরুষের অবদান শতকরা ৫৯ ভাগ। এবং বাজার বহির্ভূত কাজ হিসাবের মধ্যে নিলে জিডিপি বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ (হামিদ, ১৯৯৪)।

স্বাধীনতার পর এক পুরুষের আয় নির্ভর পরিবার টিকে থাকার বাস্তবতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন পেশায় প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত দুক্ষেত্রেই ঘরের বাইরে এসে নারীর উপার্জনের সামাজিক তাগিদ বেড়েছে। একই সময়ে নারীর অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমতও সংগঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৭৫-৮৫ সময়কালে যে নারী দশক হয় তার প্রভাবে বিদেশী তহবিল

যোগানের প্রবাহে নারী প্রশ্ন অনেক স্পষ্টভাবে যুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগকারীরাও বিভিন্ন কারণে নারীশ্রমের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

বাংলাদেশে ৭০ দশকের শেষ থেকে রপ্তানিমুখী খাতের যে প্রসার ঘটে সেখানেও নারী শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হয়। এই সব কিছুর প্রভাবে গত দুদশকে অর্থনৈতিক কাজে নারীর দৃশ্যমান অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গার্মেন্টস শিল্প। এই শিল্পের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি, এখন প্রায় ১৫ লক্ষ, নারী। এ ছাড়া প্লাস্টিক, বিড়িসহ অন্যান্য শিল্পেও নারীর অংশগ্রহণ বেশি। মাটিকাটা, ইটভাঙ্গা, খাবার দোকান ইত্যাদিতেও নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। অন্যান্য পুরানো পেশা যেমন গৃহ-শ্রমিক ইত্যাদি অব্যাহত আছে, তবে নগরায়নের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর সংখ্যা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে সরকার ও এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর বিস্তারের ফলে নারীর প্রথাগত কাজগুলোতে আরও সংগঠিতভাবে অংশ নেবার সুযোগ বেড়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসাতেও তাঁদের অংশগ্রহণ দেখা যায়।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও এখন আগের তুলনায় বাইরের কাজে বেশি অংশগ্রহণ করছে। এদের অংশগ্রহণের পেছনে দুটো কারণ-এক, পরিবারের এক পুরুষের আয়ের ঘাটতি পূরণ করা এবং দুই, নিজেদের পরিচয়, ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন বোধের বিকাশ। উদ্যোগ হিসেবেও উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত দুক্ষেত্রেই মেয়েদের অধিক অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক আইনকাঠামো, ধর্মীয়-সামাজিক-পারিবারিক বিধিনিষেধ ইত্যাদির সঙ্গে নারীর মুখোমুখী হবার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অনেক বেশি। অন্যদিকে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিকতা অনেক কম দামে নারীর শ্রমশক্তি কিনে নিতে, তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিতে বা দুর্বল করতে মালিকদের অনেক শক্তি যোগাচ্ছে।

দুই। অর্থনীতির পরিচালকেরা

রাষ্ট্র ও সরকারঃ সংবিধান, পরিকল্পনা

ক) <u>সরকারের বিভিন্ন ধরন</u>

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গত প্রায় তিন দশকে বহুরকম শাসনব্যবস্থা ও সরকার কাজ করেছে। এর মধ্যে আছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন বিপুল জনপ্রিয় সরকার (১৯৭১-৭৪), বেসামরিক একদলীয় শাসন (১৯৭৫), সামরিক শাসন (১৯৭৫-৮২), সামরিক কর্তৃত্বে নির্বাচিত সরকার (১৯৭৮, ১৯৮৬), ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার (১৯৮৮, ১৯৯৬), দীর্ঘ আন্দোলনের মাথায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত সরকার (১৯৯১, ১৯৯৬---)। শাসন পদ্ধতি ও সরকারের ক্ষেত্রে এসব ঘটনাবলী সত্ত্বেও সুস্পষ্ট একটা ধারাবাহিকতা দেখা যায় অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে। আরেকটি ধারাবাহিকতা দেখা যায় সংবিধানে বর্ণিত জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে।

খ) সাংবিধানিক অঙ্গীকার

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনায় সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলো বিবেচনা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এগুলো থেকে রাষ্ট্রের ঘোষণা ও কার্যক্রমের সম্পর্ক ও দূরত্ব বোঝা যাবে।

* প্রস্তাবনা- "সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে"।

* অনুচ্ছেদঃ ১৫- "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।

গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার। এবং

ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার---"

* অনুচ্ছেদঃ ১৭-- "রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য --- নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

* অনুচ্ছেদঃ ১৯। ২- "মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

* অনুচ্ছেদঃ ২০। ২-" রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না।"

* অনুচ্ছেদঃ ২৮ - "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।"

* অনচ্ছেদঃ৭। ২ - "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"

বাংলাদেশে ধর্ম, শ্রেণী ও লিঙ্গ বৈষম্য আকস্মিক বা আইন বহির্ভূত ঘটনা নয়, এসব বৈষম্যের আইনগত ভিত্তিও খুব শক্তিশালী, পুরানো। মাত্র কয়েকটি আইনের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়ঃ অর্পিত সম্পত্তি আইন, সংবিধানের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও রাষ্টধর্ম বিল সরাসরি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। কিন্তু এসব আইন অসামঞ্জস্য হবার কারণে বাতিল হয়নি। পারিবারিক আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সন্তানের উপর কর্তৃত্ব সরাসরি নারী-অধস্তনতাকে বৈধতা দান করে। সুতরাং এগুলো সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের বিরোধী এবং ৭।২ অনুচ্ছেদ বলে এগুলো বাতিল হবার কথা। একই অনুচ্ছেদবলে বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থাও বাতিল হবার কথা। বাতিল হবার কথা কালো টাকা বানানোর ও উৎপাদনশীল খাতকে ধ্বংস করবার যাবতীয় নীতি-পদক্ষেপ। কিছুই হয়নি। বাংলাদেশের বস্তুগত অগ্রগতি ও জনগণের অবস্থানের বিষয় পর্যালোচনার সময় সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ আমাদের মনে রাখা দরকার। এ থেকে অন্ততঃ একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কার হবে যে, সংবিধান নিজে নিজে কার্যকর হয় না, কার্যকর যারা করে তাদের অবস্থান ও ক্ষমতাই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ কার্যকর হবে আর কোন অনুচ্ছেদ অকার্যকর থাকবে তা নির্ধারণ করে।

গ) <u>পরিকল্পনা</u>

বাংলাদেশে পরিকল্পিত উন্নয়ন একটি সাংবিধানিক অঙ্গীকার হলেও অর্থনৈতিক বিকাশে পরিকল্পনার ভূমিকা সব সময়ই থেকেছে প্রান্তিক। দেশে এ যাবত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে (১৯৭৩-৭৮, ১৯৮০-৮৫, ১৯৮৫-১৯৯০, ১৯৯০-৯৫, ১৯৯৭-২০০২)। এছাড়া প্রণীত হয়েছে একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) ও একটি বার্ষিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা (১৯৭২)। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ দুবছর পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার কাজ করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনেকদিকেই ধারাবাহিকতা আছে। তবে প্রথম পরিকল্পনার কিছু আলাদা বৈশিষ্ট

আছে যেগুলো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের স্বাধীন অর্থনীতি বিকাশের উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এটি প্রণয়নে মূল ভূমিকা পালন করেন দেশের তরুণ অর্থনীতিবিদরা যারা এ কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন কোন পেশাগত কারণে নয়, আদর্শিক কারণে ও সামাজিক দায়িত্বশীলতার অংশ হিসাবে। অন্যদিকে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলো প্রণয়নে মূখ্য ভূমিকা ছিল আমলা বা 'দাতা' মনোনীত উপদেষ্টাদের। নুরুল ইসলাম প্রথমটি সম্পর্কে সঠিকভাবেই বলেছিলেন, "পেশাজীবি বিশেষজ্ঞ প্রভাবিত ও আমলাদের বদলে অর্থনীতিবিদদের দ্বারা পরিকল্পনা কমিশন পরিচালিত হবার ঘটানাই ছিল অতীতের ধারা ভেঙে অগ্রসর হবার একটি লক্ষণ" (ইসলাম ১৯৭৯ঃ৬)। সমাজে ও অর্থনীতিতে অতীতের ধারার পুনরাবৃত্তি না করা ও নতুন নির্মাণের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পরিকল্পনা ক্ষেত্রেও তা টিকে থাকতে পারেনি।

অসঙ্গতি, দুর্বলতা সত্ত্বেও শুরুর যা কিছু উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সেগুলোর কথা বাদ দিলে সবগুলো পরিকল্পনার মধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য দেখা যায়। যেমন- (ক) কোন পরিকল্পনা নিয়েই জনগণকে সম্পৃক্ত করে কোন আলোচনা-পর্যালোচনা-বিতর্ক হয়নি এমনকি সংসদেও বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়নি। (খ) সবগুলো পরিকল্পনাই শেষ হয়েছে অনেকগুলো অসমাপ্ত প্রকল্প নিয়ে। (গ) কোন পরিকল্পনাই সরকার গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। (ঘ) সবগুলো পরিকল্পনাই কার্যতঃ বিদেশী 'সাহায্য' সম্পর্কিত প্রকল্পের সমষ্টি, যেগুলোর প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন দেশীয় পরিকল্পনা গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়। পরিকল্পনার বাস্তব চেহারা বোঝার জন্য একজন প্রাক্তন আমলার একটি বাক্যই, বলা ভালো স্বীকারোক্তি, যথেষ্ট-"মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের পরিকল্পনার সেলগুলো খুবই দুর্বল। এগুলো কার্যতঃ দাতা সংস্থাগুলোর অঙ্গ হিসেবে কাজ করে' (টাস্কফোর্স-২ঃ২০০)*।

প্রথম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলঃ দারিদ্র ও বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং স্বনির্ভর উন্নয়ন। ৮ বছর এই লক্ষে কাজ করবার ফলাফল যা হয় তা বোঝা যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা দলিলের বক্তব্য থেকে। এখানে বলা হয়ঃ " দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ এখন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেছেন।" এখানেও অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে দারিদ্র বিমোচনকে ধরা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা দলিলে বলা হয়ঃ "দেশে এ যাবতকালে পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যই ছিল দারিদ্র বিমোচন, স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ অংশের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের বরাবর চেষ্টা নেয়া হয়েছে।" কিন্তু একই দলিল

আবার এটাও বলে যে, "ক্রমবর্ধমানহারে গ্রামীণ জনগণ ন্যূনতম পুষ্টিসীমার নীচে পতিত হচ্ছেন। অব্যাহত দারিদ্রের সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্ব অপুষ্টি, নিরক্ষরতা জটিল আকার ধারণ করছে।" এই কারণে দারিদ্র বিমোচনকে এখানেও মূল লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা দলিলে কিছু নতুন বাক্যবিন্যাস দেখা যায়। বলা হয় 'নয়া' উন্নয়ন কর্মসূচী'র কথা, বলা হয় 'নতুন দর্শনের' কথা। এই দলিলে উন্নয়ন অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে এখানেও পুরনো কর্মসূচী ও ধাঁচেরই পুনরাবৃত্তি হয়। পঞ্চম দলিলে যোগ হয় আরও কিছু আশ্বাস।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা, প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির কোন বিশেষত্ব নেই। বিশ্বব্যাপী এই প্রতিষ্ঠান সামাজিক অর্থনৈতিক যে বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছে তাতে তার ভূমিকার এই আন্তর্জাতিক মাত্রাটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে অর্থশাস্ত্র ও দর্শন বিশ্বব্যাংকের চালিকা শক্তি সেটিও এই বিকাশধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। আইএমএফ এবং সদ্য গঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে নিয়ে বিশ্বব্যাংক এখন যে ত্রয়ী গঠন করেছে সেটিই কার্যত এখন বিশ্বে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আন্তর্জাতিক পুঁজির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকের শক্তিবৃদ্ধি সুনিশ্চিতভাবেই সেই পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও শক্তি বৃদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ এখন কোন বহিঃস্থ শক্তি হিসাবে নয় বরং অন্তস্থ, শাসক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অংশেরই ভূমিকা।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা পাকিস্তানের পক্ষেই ছিল। এছাড়া ১৯৭১এর আগে পাকিস্তানের পরিকল্পনা-উন্নয়ন ইত্যাদিতেও বিশ্বব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টাদের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব কারণে স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাংক দুটোরই গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক কম। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক আকাঙ্ক্ষার প্রভাবে এমনকি সরকারী পর্যায়ে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক চেতনার যে উপস্থিতি অল্প সময়ের জন্য দেখা যায় সেখানে বিশ্বব্যাংক ছিল খলনায়কের অবস্থানে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের গভর্ণর রবার্ট ম্যাকনামারার সফরকালে তাঁর প্রতি সরকারের মনোভাব তার জন্য খুব সম্মানজনক ছিলনা।

কিন্তু অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম সে সময়কার অবস্থার সারসংক্ষেপ করেছেন

এভাবেঃ "বাংলাদেশের সামনে দুটো পথ খোলা ছিল- একটি হল কঠোর কৃচ্ছতাসাধনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়া যার জন্য দরকার ছিল আদর্শিক প্রেরণা, সেসময় এটা কোন সমস্যা ছিল না। দ্বিতীয় পথটি ছিল ধনী ও ক্ষমতাশালী দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশী সাহায্য নেয়া যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করে" (ইসলাম, ১৯৭৯ঃ৮)। এর মধ্যে দিয়েই বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নিজের জায়গা করে নেয়। ৭২ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর সদস্য হয়। তারপরের পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন সম্পর্কে সে সময়ের রাষ্ট্রীয় নীতির ঘনিষ্ঠ অংশীদার ও পরে পর্যবেক্ষক রেহমান সোবহান বলছেনঃ "এর পর থেকে পুরনো প্রকল্প পর্যালোচনা ও নতুন ঋণ কর্মসূচি পর্যালোচনার জন্য একের পর এক মিশন আসতে থাকে। বাংলাদেশ ততদিনে সাহায্যের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে" (সোবহান, ১৯৮২:১৭৩)। বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানের মতোই বাংলাদেশের জন্য এইড ক্লাব গঠন করে যা তাদেরকে পুরোপুরি অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। মোটামুটি গুছিয়ে বসবার পরও বিশ্বব্যাংক তৎকালীন সরকারের "সমাজতান্ত্রিক" কথাবার্তার জোর কোন সমালোচনা করেনি বরঞ্চ ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তারা প্রশংসাসূচক বক্তব্যই রেখেছে। একই সঙ্গে তারা গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায়ের জন্য কুমিল্লা মডেলেরই সুপারিশ করেছে (বিশ্বব্যাংক, ১৯৭৪)।

১৯৭৫ এর শুরুতে "দ্বিতীয় বিপ্লব" ও "শোষণমুক্ত সমাজ" এর জন্য যখন একদলীয় শাসন জারী হয় তখনও বিশ্বব্যাংককে বেশ প্রসন্নই মনে হয়েছে। তাদের দলিলে তখন বলা হয়েছেঃ "সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আইন শৃঙ্খলার অবনতি রোধ, চোরাচালানী, মজুতদারী, বস্তি উচ্ছেদে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করেছে। সাহায্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার ও দাতাসংস্থাসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বেশ ভাল কাজে দিচ্ছে।" তাদের উদ্বেগ ছিল সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বেতন বেঁধে দেয়ায়। চাপ ছিল, অর্থনৈতিক 'সংস্কার' ত্বরান্বিত করবার (বিশ্বব্যাংক,১৯৭৫)। উল্লেখ্য মে মাসেই বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচী শুরু হয়।

১৯৭৫-এ রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরেও বিশ্বব্যাংকের প্রশংসাসূচক বক্তব্য পাওয়া গেছে (বিশ্বব্যাংক, ১৯৭৬)। এর পরের দুইদশক বিশ্বব্যাংকের অব্যাহত বিজয়গাঁথা রচিত হয়। এদেশের অর্থনীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেই বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা এরপর থেকে ছিল নির্ধারক। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ইকনমিক মেমোরেন্ডাম বস্তুতঃ

অর্থনীতির দিকনির্দেশক হয়ে দাঁড়ায় (ভট্রাচার্য্য, ১৯৯৪; সায়েদুজ্জামান,১৯৯৫)। ১৯৮৬-৮৭ থেকে পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক পেপার আরও শক্তিশালী দিকনির্দেশকে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সায়েদুজ্জামানের বক্তব্য খুব প্রাসঙ্গিকঃ "ব্যাংক ও আইএমএফ সব সময়ই বলতে চায় যে, এই পেপার সরকারের, কিন্তু এটি তারা সব সময় নিজেরাই তৈরী করতে চায়" (সায়েদুজ্জামান,১৯৯১ঃ২৭১-৮১)। বিশ্বব্যাংকের তৎপরতা যে মূখ্যতঃ আমদানী বৃদ্ধির জন্যই নিবেদিত তা তাদের ঋণ কর্মসূচী থেকে স্পষ্টঃ "১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৯২-৯৩ সময়কালে তাদের ঋণ কর্মসূচীর সব চাইতে বড় অংশ আমদানী সহায়তার জন্যই দেয়া হয়েছে" (ভট্রাচার্য্য,১৯৯৪)।

বাংলাদেশ এযাবতকালে যেসব গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেগুলো কোথায় এবং কিভাবে গৃহীত হয়েছে সেটা খুবই লক্ষণীয় বিষয়। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি এবং তার সংগে সম্পর্কিতভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ, আমদানি ও রপ্তানি নীতি, গ্যাস চুক্তি স্বাক্ষর, অর্থকরী প্রতিষ্ঠানে সংস্কার, কর কাঠামোর বিন্যাস ইত্যাদি সকল সিদ্ধান্ত এবং দেশের নির্বাচন-গণতন্ত্র-নির্বাচিত সংস্থার সম্পর্ককে বিচার করলে দেখা যাবে এই দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং পরেরটির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দ্বারা আগেরটিব প্রভাবিত হবে না। আগেরটি পুরোপুরি স্বাধীন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের স্বচ্ছ চেহারা নেই। বিশ্বব্যাংক এসব সিদ্ধান্তের কেন্দ্রীয় শক্তি। বাস্তবতঃ দেখা যাবে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কুশাসনে যারা যত বেশি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে তাদের জবাবদিহিতার সুযোগ তত কম। এ ক্ষেত্রে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তারা হল, বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহ, আমলাতন্ত্র, বৃহৎ ব্যবসায়ী সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। আন্দোলন, নির্বাচন, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর সীমিত জবাবদিহির কিছু ব্যবস্থা সৃষ্টি হলেও অন্যদের কোনরকম জবাবদিহিতার সুযোগ নেই।

এনজিও

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বয়স প্রায় ২৫ বছর হতে চললো। স্বাধীনতার পর, বিশেষতঃ মধ্য ৭০ দশক থেকেই এনজিও নামক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনের প্রসঙ্গে এনজিও-র কথাই আলোচনায় বেশি আসে। বস্তুতঃ গ্রাম ও পরিবার পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ত্রাণ বিষয় কর্মসূচির জন্য এখন এনজিওর নাম বেশি উচ্চারিত হয়। সরকার ও বাজারের চলতি বিতর্কে এনজিওকে একদিকে যেমন সরকারের ব্যর্থতার ফসল

হিসেবে বর্ণনা করা যায় আবার সেইসঙ্গে এটাকে বাজারের ব্যর্থতার ফসল হিসেবে দেখা যায়। এদুটোর কোনটি এনজিওর পিছনে নির্ধারক তা নিয়ে মতবিরোধ আছে, এর মধ্যে না গিয়ে বলা যায় এদুটোর মধ্যেই সত্যতা আছে। কিন্তু এক্ষত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজার ও সরকারকে এভাবে আদৌ আলাদা করে দেখা যায় কিনা। এই কাঠামোতে চিন্তা করলে আমরা তৃতীয় মতটি পাই সেটি হলো প্রান্তস্থ সমাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সমস্যারই ফসল এনজিও।

বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি এনজিও দেশে কাজ করছে। প্রায় ১ লাখ কর্মী এসব সংস্থায় কাজ করছেন এবং এসব সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ নেটওয়ার্কে জড়িত আছেন প্রায় ৪০ লাখ মানুষ, যাদের অধিকাংশ নারী (এনজিও ব্যুরো,১৯৯৫)। এসব এনজিওর মূল বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো প্রায় সর্বাংশে বিদেশী তহবিল নির্ভর (মুহাম্মদ, ১৯৮৮,১৯৯৬; সেন ১৯৮৯), সরকারী না হলেও রাষ্ট্রীয় নীতি-পরিকল্পনার অধীনস্থ, এদের প্রায় সকলেই টার্গেট গ্রুপ কেন্দ্রীক কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, "১০টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এনজিওর (দেশী ও আন্তর্জাতিক) মোট বাজেটের ৯৩.৯৯%ই আসে বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা থেকে। প্রাপ্ত তহবিলের ৭.৮২% খরচ হয় স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে; ১০.৪৬% খরচ হয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য এবং ২১.২৬% খরচ হয় ক্ষুদ্রঋণ বাবদ" (ভট্রাচার্য্য, সালেহ উদ্দীন, ১৯৯৫)। অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ১০০ টাকা ঋণ দেবার জন্য খরচ হয় প্রায় ৬০ থেকে ৮০ টাকা (সেন, মুহাম্মদ,পূর্বোক্ত)। এনজিও মডেলে ঋণ প্রদান কর্মসূচির সবচাইতে সার্থক প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টান্ত হল গ্রামীণ ব্যাংক। লাভজনক ব্যাংক হিসেবে এর সাফল্য প্রশ্নাতীত, তবে দারিদ্র বিমোচন, আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি এর ভূমিকা নিয়ে যে ধারণা প্রচলিত তার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের সঙ্গত কারণ আছে। ওসমানী গ্রামীণ ব্যাংক মডেলকে লেইসেজ-ফেয়ার আপ্রোচ বলেছেন; লুইস এটিকে পুরনো চুঁইয়ে পড়া তত্ত্বেরই সফল বাস্তবায়ন বলেছেন; ওয়েষ্টারগার্ড পুরো এনজিও কর্মসূচিকেই বিশ্বব্যাংক ও 'দাতা' সংস্থাসমূহের বেসরকারী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (ওসমানী,১৯৮৯;লুইস,১৯৯৪; ওয়েষ্টারগার্ড,১৯৯৬)।

নারীর আয় উপার্জনে বিরাট ভূমিকা পালনের জন্য এনজিও কর্মসূচীকে যেভাবে একক কৃতিত্ব দেয়া হয় তাতে এদেশের শ্রমজীবী পরিবারগুলোতে এনজিও উদ্ভবের অনেক আগে থেকে নারীর শ্রমচেষ্টা কাজকে অস্বীকার করা হয় এবং এটাও আড়াল করবার চেষ্টা হয় যে, "এনজিওগুলোর মধ্যে নারী-সম্পর্কিত কাজের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন

করেছে। কিন্তু এগুলোর কেউই উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রাপ্তির সম্ভাবনাযুক্ত কাজে নারীকে উন্নীত করবার মতো উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি" (হামিদ, ১৯৯৫ : ১৫১)। ঋণ ব্যবহারের মূল প্রবণতা হল ব্যবসা।

এনজিও কর্মসূচীর কারণে পরিবার পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সচেতনায়নের বিস্তার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় এর সপক্ষে তথ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু দারিদ্র পরিস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, জাতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যে এর খুব জোরদার প্রভাব টের পাওয়া যায় না। গ্রাম পর্যায়েও বিভিন্ন গবেষণায় এর গুণগত দিকটি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এনজিও সম্পর্কে প্রচলিত ও প্রচারিত উচ্ছ্বাসকে ম্লান করে দেয়। বিআইডিএস-এর দারিদ্র বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় ১৭টি গ্রামের উপর পুনঃসমীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, শতকরা ২৪ ভাগ জানিয়েছেন তাদের অবস্থার অবনতি হয়েছে এবং ৫৮ ভাগ তাদের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে বলে জানিয়েছেন। যাদের উন্নতি হয়েছে সেই শতকরা ১৯ ভাগের এর মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ তাদের উন্নতির পেছনে এনজিও-র ভূমিকা আছে বলে জানিয়েছেন (রহমান, ১৯৯৫)।

তিন। সম্পদ, আয়, কর্মসংস্থান এবং লুম্পেনাইজেশন

সামাজিক বিন্যাসে পরিবর্তন

বাংলাদেশে অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে ভাঙচুর হয়েছে, অভ্যন্তরীণ গঠন ও বৈশ্বিক যোগাযোগে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তা সমাজে শ্রেণী গঠন ভাঙ্গনকেও নির্ধারণ করেছে। পুরনো শ্রেণীসমূহ ও সেগুলোর আন্তঃসম্পর্ক, আপেক্ষিক শক্তিবিন্যাস একইভাবে নেই। অর্থনীতির ভরকেন্দ্র এখন আর কৃষি নয়; তাই কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের সংখ্যা কমছে, কৃষি এখন মুনাফার বিচারে কম আকর্ষণীয়। অর্থনীতির ভরকেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে ব্যবসা ও সেবাখাত। গ্রাম শহরে, শিল্প ও কৃষির সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির হারের চাইতে অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে জানা-অজানা ব্যবসা ও সেবাখাতের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির হার। তাছাড়া আয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় গত দুই দশকে অন্যান্য খাতে নীট আয় কমলেও এই খাতগুলোতে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (সেন, বিশ্বব্যাংক ঃ ১৯৯৬)।

গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যায় ১৯৭২-৭৩ সালে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের শতকরা হার ছিল ৩৩ ভাগ, অর্থাৎ সেসময় কৃষকরাই ছিলেন গ্রামের সংখ্যাগুরু

জনগোষ্ঠী, বর্তমানে ভূমিহীন মজুরদের হার শতকরা ৬০ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী এখন আর কৃষক নন, মজুর। এই মজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিতে কর্মসংস্থান তৈরী হয়নি। ফলে অকৃষিখাতে এদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। বেড়েছে শহরে কাজের খোঁজে পাড়ি দেয়া মানুষের সংখ্যা। ঢাকা শহরের সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী, ঢাকার শতকরা ৬১ ভাগেরও বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন, কয়েক লক্ষ মানুষ ফুটপাতে রাত্রি যাপন করেন। এদের অধিকাংশই প্রাক্তন কৃষক, বর্তমানে টুকটাক কাজে নিয়োজিত কিংবা কর্মহীন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫-৯৬ এর শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী দেশে মোট কর্মহীনের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ, যার মধ্যে পুরুষ ৯০ লক্ষ। মোট সক্রিয় শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৬৫ লক্ষই শিশু।

সম্পদ ও আয়ের মেরুকরণ

দেশে কৃষি ও শিল্পের তথ্যাবলী থেকে আমরা পরিষ্কার দেখি যে, অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উৎপাদন কিছুমাত্রায় বেড়েছে। খাদ্য উৎপাদন যা বেড়েছে তাতে মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্তি বেড়েছে। কিন্তু আমরা আবার একই সঙ্গে দেখি অনাহারী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি। শিল্প উৎপাদন সূচক দেখলে সেখানেও আমরা বৃদ্ধি পাই কিন্তু পাশাপাশি আবার দেখি মজুরদের প্রকৃত আয় হ্রাস। সর্বনিম্ন ৫% ও সর্বোচ্চ ৫% এর আয়ের অংশ বিচার করলে আমরা দেখি সর্বনিম্ন ও নীচের আয় গ্রুপের আয় হ্রাস, উচ্চ আয় গ্রুপের আয়বৃদ্ধি। সর্বোচ্চ আয়ের ৫% এর আয় যে হারে বেড়েছে, সর্বনিম্ন ৫% এর আয় কাছাকাছি হারেই কমেছে। জিডিপিতেও কৃষি শিল্প-স্বনিয়োজিত শ্রমিকদের অংশীদারীত্ব কমেছে।

সারণী -১২। মোট আয়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানুষের আয়ের শতকরা অংশ

পর্যায়	বছর					৮৩-৯৬ এর পরিবর্তনের হার
	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৮-৮৯	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	
সর্বনিম্ন আয়ের ৫%	১.১৭	১.১৮	১.০৬	১.০৩	০.৮৮	-২৪.৭৯
সর্বোচ্চ আয়ের ৫%	১৮.৩০	২১.৩৫	২০.৫১	১৮.৮৫	২৩.৬২	+২৯.০৭

সূত্রঃ বিবিএস. পূর্বোক্ত।

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা ছিল হাতে গোণা কয়জন। বর্তমানে নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা কঠিন তবে আন্দাজ করা যায় তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার। দেশে ব্যয়বহুল গাড়ি-বাড়ি জীবনযাপন ইত্যাদিকে নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করলে বোঝা যায় গত প্রায় তিন দশকে দেশে একটি বিপুল বিত্তশালী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্লেষণে এটা সুনির্দিষ্টভাবে ধারণা করা যায় যে, এদের সংখ্যা শতকরা ১ ভাগের বেশি হবে না। অন্যদিকে এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আয়কর চিত্র দেখলে বোঝা যাবেনা। বিত্তবানদের উদ্ভব ও দেশে কালো টাকার অভূতপূর্ব শক্তি বৃদ্ধি-এ থেকে বোঝা সম্ভব।

জীবনযাত্রার ব্যয়, ভাঙচুর ও নতুন আয়ের সন্ধান

সীমিত আয়ের লোকের মধ্যে একদিকে নতুন ব্যয় কাঠামোর প্রভাব পড়েছে অন্যদিকে তাদের প্রকৃত আয় কমেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে শতকরা প্রায় ২০৪৮ ভাগ। নীচের সারণীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজের বিভিন্ন পেশায় প্রকৃত আয় কিভাবে কমেছে। বিশ্বব্যাংক সাধারণভাবে মজুরী ও বেতন বৃদ্ধির বিরোধী, যদিও বৃদ্ধি নয় ৭২-৭৩ এর সমান করতে গেলেই মজুরী-বেতন দুইগুণেরও বেশি বাড়াতে হয়। বিশ্বব্যাংক অবশ্য তার সর্বশেষ দলিলে সচিবদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে নমনীয়তা দেখিয়েছে (বিশ্বব্যাংক,১৯৯৬)।

সারণী -১৯ । সরকারী বেতন/মজুরীর বিকাশ ধারা, ১৯৭২-৯৮

পেশা	৭১-৭২ সালে মূলবেতন /মজুরী	৯৮ সালে প্রাপ্ত মূলবেতন/ মজুরী	৭২ সালে সমান ক্রয় ক্ষমতা হলে মূলবেতন/মজুরী কমপক্ষে কত হবে	৭২ সালের তুলনায় প্রকৃত আয়(%)
রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প শ্রমিক	১২৫	৯৫০	২৫৬০.০০	৩৭.১০
বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী	৪৫০	৪৩০০	৯২১৬.০০	৪৬.৬৫
সচিব	১২০০	১৫০০০	২৪৫৭৬.০০	৬১.০৩%

প্রকৃত আয় কমা সত্ত্বেও ভোগ কাঠামোতে নতুন নতুন দ্রব্যের সংযোজন ও ব্যয়বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা আরও কিছু বিষয় পাই যেগুলো গত আড়াই দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে বিকশিত হয়েছে ঃ

(১) পেশাজীবী-শ্রমজীবী উভয় স্তরে এক-পুরুষের আয় নির্ভর পরিবারের ধারণা ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে। পরিবারের নারী সদস্যদের আয় এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এরই বহিঃপ্রকাশ।

(২) নির্ধারিত কাজের বাইরে বাড়তি আয়ের অনুসন্ধান, বৈধ ও অবৈধ, একটি স্বাভাবিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে।

(৩) কাজ ও আয়ের সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বিদেশে গমন একটি পথ হিসেবে অনেকেরই চেষ্টার ক্ষেত্র। সেটি আবার অন্যদিক থেকে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

(৪) সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে প্রকৃত বেতনের হ্রাস ঘটলেও বাড়তি আয়ের কিছু পথ তৈরী হয়েছে, বিদেশী সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প, গবেষণা, বিদেশ সফর ইত্যাদি। এছাড়া এমনকিছু পেশা তৈরী হয়েছে যেগুলোতে উচ্চ পর্যায়ের বেতন সরকারী-আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, বিদেশী ব্যাংক-আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, বেসরকারী ক্লিনিক, টিউটোরিয়াল, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃহৎ ব্যবসায়িক গ্রুপ ইত্যাদি।

(৫) সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে ঘুষ, দুর্নীতি এখন সার্ভিস চার্জ হিসেবে বিবেচিত হয় যা অন্যদিকে সরকারের বাড়তি ব্যয় সৃষ্টি করে সিস্টেম লস হিসেবে। জনগণের করের অর্থ এভাবে স্থানান্তরিত হয় এবং নতুন কনজিউমার গোষ্ঠী তৈরী করে। ভোগ্যপণ্য আমদানীর সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে।

(৬) গত আড়াই দশকে দেশে বেসরকারী খাতের সম্প্রসারণ সবচাইতে বেশি দেখা যায় ব্যবসা ও সেবা খাতে। সেকারণে ঢাকা শহরে যে সব ব্যবসায়িক ও সার্ভিস ওরিয়েন্টেড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য সেগুলোর মধ্যে আছেঃ চাইনিজসহ বিভিন্ন আয় গ্রুপের হোটেল রেস্তোরাঁ, ইভেন্টিং প্রতিষ্ঠান, হাত দেখা-জ্যোতিষবিদ্যা, গাড়ির দোকান, বিউটি পার্লার, সুপার মার্কেট, টেলিফোন-ফ্যাক্স এর বাণিজ্য দোকান, ডিশ ব্যবসা, ভিডিও দোকান, কম্পিউটার, ক্লিনিক, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান যে ধরনের পেশার চাহিদা তৈরী করেছে তার অস্তিত্ব আগে ছিল না।

উপসংহার

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, নির্বাচিত সংস্থা এবং সংবিধানে বর্ণিত "অর্থনৈতিক নীতি ও জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার" উপেক্ষা

করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। এখানে জবাবদিহিতার কথা নিছকই অবান্তর। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি আনা ও পুঁজিবাদী বিকাশ ত্বরান্বিত করবার জন্য যে বহুরকম সংস্কার প্রয়োজন সে সম্পর্কে দ্বিমত থাকবার কোন কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন সংস্কার আমাদের শাসক শ্রেণী নিজেরা সুচিন্তিতভাবে, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার চর্চা দিয়ে, সুসমন্বিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে করেছে? একটি দৃষ্টান্ত কি আছে? যেসব কর্মসূচী সংস্কারের নামে সবাই গ্রহণ করছেন তার গ্রহণ-বর্জন মাত্রা ঠিক করবার কোন উদ্যোগ কি আছে? এর সাফল্যের অংশীদার অনেক, কিন্তু ব্যর্থতার ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার জনগণ হলেও দায়ভার নেবার কেউ নেই।

মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্পর্কে সবগুলো বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে এখন অভূতপূর্ব ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে এসব দলের নীরবতা, চিন্তাহীনতাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলো প্রয়োজন হলে কিভাবে করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজন না হলে কেন নয় সে ব্যাপারে ন্যূনতম কোন আলোচনা-চিন্তাভাবনার খবরও পাওয়া যায়না। ১৯৯১ সালের টাস্কফোর্স রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে এখন রাষ্ট্রীয় নীতিই এমন যে, ব্যবসায়ীরা উদ্যোক্তাদের চাইতে ভাল অবস্থায় আছে এবং চোরাচালানীরা ব্যবসায়ীদের চাইতে ভাল অবস্থায় আছে। বর্তমানে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে এরকম কেউ দাবী করবে বলে মনে হয়না। অর্থাৎ একদিকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগকারীদের পুরস্কৃত করা ও অন্যদিকে লুটপাটকারী বা উৎপাদনশীল খাতের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান-এরকম কোন অবস্থা সৃষ্টি হয়নি বরং বিপরীত চিত্রটিই এখনও আধিপত্য বিস্তার করে আছে। আবারও বলা দরকার যে, বাজার "স্বয়ংক্রিয়ভাবে" যাদের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে তারা উদ্যোক্তা নয়।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির অগ্রগতির পরিমাণগত ধীরগতি ও গতিমুখের গুণগত দুর্বলতা-ঝুঁকির কেন্দ্রীয় বিষয় হলোঃ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে শ্লথতা। এর সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কের ধরন ইত্যাদি। বাংলাদেশে অর্থনীতির অভ্যন্তরে গতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় এদেশে প্রাক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের মধ্যে অনেক ভাঙচুর হয়েছে। পুঁজিবাদী সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান আগের তুলনায় অনেক বিকশিত হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল এসবের মধ্যে দিয়ে প্রথমতঃ বাংলাদেশের প্রান্তস্থঃ

অবস্থান ঘোচেনি, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক পুঁজির গতিপ্রকৃতির পেছনে অন্ধভাবে হাঁটছে, তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী, বৃহৎ বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়, বিশেষজ্ঞ মহল নিজেদের নিজস্ব উৎপাদনশীল ভিত্তি গড়ে তোলার স্বাক্ষর এখনও রাখতে পারেনি এবং ফলে চতুর্থতঃ এদেশে শিল্প-কৃষি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শক্তভিত্তি গতিশীলতা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়নি। এর পেছনে তিনটি কারণ এখানে চিহ্নিত করা যায়ঃ

(১) বাংলাদেশেরর শাসক শ্রেণী অর্থাৎ বিদ্যমান সমাজের নেতৃত্বদানকারী শ্রেণীর মধ্যে ঝুঁকিপ্রিয় সৃজনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণীর আপেক্ষিক দুর্বল অবস্থান। এই দুর্বল অবস্থান প্রতিফলিত হয় একই সঙ্গে সরকার, সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা ও ব্যবসায়িক গ্রুপগুলোর মধ্যে। যে কারণে উৎপাদনমুখী বিকাশের কোন দৃঢ় সমন্বিত পদক্ষেপ কোন দিক থেকেই দেখা যায়না।

(২) অর্থনীতির উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল খাতে পুনর্বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের অভাব উপরের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। একই কারণে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত সম্পদের কার্যকর কোন ব্যবহার সম্ভব হয়না এবং এর অধিকাংশ অপচয় বা লুটপাট বা পাচারের শিকার হয়। এবং এ থেকেই সৃষ্টি হয় বিদেশী 'সাহায্য' নির্ভরশীলতা, যার উপর গড়ে উঠে এক সুবিধাভোগী গোষ্ঠী, যারা নিজেরা অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলয় সৃষ্টি করে, যে বলয় রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রকেও প্রভাবিত করে। এবং

(৩) বিদেশী 'সাহায্য' নির্ভর অপচয়-দুর্নীতি সৃষ্টিকারী, সম্পদ বিধ্বংসী, পরিবেশ বিনষ্টকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আধিপত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজে উপর থেকে নীচু পর্যন্ত নির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তির একটি সংস্কৃতি প্রবল পরাক্রমে বিকাশ লাভ করেছে। এর ফলে সরকার, এনজিও এবং সরকার বহির্ভূত সমজাতীয় রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, পেশাজীবী সর্বত্র নির্ভরশীলতা ও কপটতা মহামারীর আকার নিয়েছে। এই মহামারীর মধ্যে কোন আত্মবিশ্বাসী জাতীয় উদ্যোগ গড়ে ওঠা অসম্ভব।

এই অবস্থার পরিবর্তন করতে গেলে বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে লাভবান দেশী-বিদেশী শ্রেণীগোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক শক্তিকে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সেজন্য 'নির্দোষ', অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুপারিশ এ অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়কে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না।

তথ্য নির্দেশিকা

Abdulla, Abu (ed.) (1991). "The Unrecorded Economy of Bangladesh: Some Preliminary Estimates". Paper presented at the BEA Comference.

Abdullah, abu, and Azizur Rahman Khan. (ed.)(1996). *Sate Market and Development.* Essays in honour of Rehman Sobhan.

Anderson, Kathryn H., Najmul Hossain, and Gian s Sahota (1991). "The effect of labour laws and labour pracitces on employment and Industrialization in Bangladesh". *Bangladesh Development Studies*, Special issue.

Bakht. Zaid (1996) Cross Border illegal trade in Bangladesh: Composition, trends and policy issues, Dhaka: BIDS.

Bangladesh Bank (1990). *Foreign Liabilities and Assets and Foreign Investment in private sector in Bangladesh*. Dhaka.

BBS (1994). *Bangladesh Population Census*, 1991.

BBS (1994). *Statistical Yearbook of Bangladesh*, 1993.

BBS (1995). *Report on Labour force Survey*, 1991-92

BBS (1995). *Report on the Household Expenditure Survey*, 1991-92

BBS (1998). *Report on the Household Expenditure Survey*, 1995-96.

Bhattacharya, Debapria (1994). "A Tale to two Sisters: Two Decades of the Bank and the Fund in Bangladesh." August, Dhaka.

Bhattacharya, Debapriya (1995). "Bangladesh's experience with the strucutural adjustment and enhanced structural adjustment facilities" in Roy H Grieve & Mozammel Haq(ed) *Bangladesh Strategies for Development*. Dhaka.

Bhattacharya, Debapriya (1996). "Micro Evidence on Rural Non-Farm Growth and Policy Impications", BIDS- World Bank Workshop, Dhaka.

Bhattacharya, Debapriya and Salehuddin (1995). GO-NGO Collaboration in Human development initiatives in Bangladesh". mimeo, BIDS.

CPD (1994). *CPD Dialogue Report*, No.1.

CPD (1996). Experiences with Economic Reform-A Review of Bangladesh's Development, Dhaka.

Dilip Kumar Roy (1993). "Privatisation, Trade and Liberalisation in Bangladesh Service Economy." Bangladesh Journal of Political Economy.

GOB(1972). *Budget Speech of Tajuddin Ahmed*. Dhaka: M/O Finance.

GOB(1974). *Budget Speech of Tajuddin Ahmed*. Dhaka: M/O Finance.

GOB(1981,1986,1991). *Bangladesh Economic survey*. Dhaka: M/O Finance.

GOB(1995, 1996, 1998). *Bangladesh Economic Review*. Dhaka: M/O Finance

Hosain. Mahbub (1995). "Agricultural Policy Reforms in Bangladesh: An Overview" Paper presented at a workshop organized by the University of Oxford and the Center for Studies Sciences. Calcutta. India.

Islam. Nurul (1979). *Development Planning in the third world.* Dhaka.

Kamal Siddiqui, Sayeda Rowshan Qadir, Sitara Alamgir, Sayeedul Huq (1990). *Social Formation in Dhaka City*, Dhaka.

Khan. A.R. &j Mahbub Hossain (1989). *The Strategy of Development in Bangladesh.* London.

Khan. Akbar Ali (1995). "Saving in Bangladesh: Trends, Determinants and Policy Options". *Journal of Asiatic Society of Bangladesh.* Hum. vol 40. no.2.

Lewis. David J. (1994). "Catalyst for change. NGOs, Agricultural Technology and the State in Bangladesh". *The Journal of Social Studies*. No. 65.

M. Syeduzzaman (1991). "Bangladesh's Experience with Adjustment policies" in Rehman Sobhan(ed)*Structural Adjustment policies in the Third world,* Dhaka.

M. Syeduzzaman (1995). "Current Macro-Economic and Sectoral Trends in Bangladesh Economy-Some Comments on the Three Recent Reports" Paper presented at the seminar organized by BEA, Dhaka.

Muhammad . Anu (1995). "The Economics of the World Bank, Growing resources Increasing depreivation". *Holiday.*

Muhammad, Anu (1996a). "Actors, Victims and the Rhetoric: A Deconstruction of "Development" Exercise in Bangladesh". Paper presented in the Seminar organised by the Social Science Fculty, Jahangirnagar University.

Muhammad. Anu (1996b). "Intergration, Polarization and Retreat: Some Observations on the SAP, PAP and the NGO exercise in Bangladesh". Paper Persented in the Seminar organised by the Morgan State University and Jahangirnagar University.

Mujeri. Mustafa K., and Sajjad Zohir (1995): "Macro-Economic Developments of the Bangladesh Economy: A Review of Three Reports, Paper presented at a seminar organized, BEA.

Mujeri, Mustafa K., Ouazi Shahabuddin and Salehuddin Ahmed (1993). "Macro economic Performance, Structural Adjustments and Equity: A Frame-work for analysis of Macro-Micro Transmission Mechanism in Bangladesh". In *CIRDAP Monitoring Adjustment and Poverty Bangladesh: Report on the framework Project.*

N. Alam and F. Cookson, "Cross border trade with india" (mimeo), Bangladesh Bank, July 1995.

Non-market Work and National Income. The Case of Bangladesh", *The Bangladesh Development Studies*, Vol XXII.

Planning Commission (1973). *First Five Year Plan.*

Planning Commission (1985). *Third Five Year Plan.*

Planning Commission (1990). *Fourth Five Year Plan.*

Planning Commission (1997). *Fifth Five year Plan.*

Planning Commission(1980). *Second Five Year Plan.*

Rahman. Mashiur (1994): *Structural Adjustment. Employment and Workers.* Dhaka.

Ravallion. Martin. and Binayak Sen (1994). When Method matters. Towards a Resolution of the Debate over Bangladesh's Poverty Measures. Policy Research Working Paper. World Bank. Washington.

Rehman Sobhan (1982). *The Crisis of External Dependence*, Dhaka.

Rehman Sobhan (1992). *From Aid Dependence to Self Reliance*, Dhaka:UPL.

Rehman Sobhan (ed.) (1990). Structural Adjustment Policies in the third World, a BIDS-WIDER Seminar Report, Dhaka.

S.R. Osmany (1989). "Limis to the Alleviation of Poverty through Non-farm Credit", *The Bangladesh Development Studies*, vol, XVII.

Saderel Reza (1995a). *Transnational Corporations in Bangladesh*. Dhaka: UPL.

Sadrel Raza (1995b). "The Underground Economy: A Preliminary Sketch", mimeo, BIDS.

Salim Rashid (ed.) (1996) "An assessment of industrial policy in Bangladesh: What policies are we talking about?"

Sattar Zaidi (1995). "The State of the Bangladesh Economy". Paper presented at a Seminar organized by BEA.

Sen, Binayak (1989). 'NGO in Bangladesh Agriculture. An Exploratory Study", in *Bangladesh Agriculture Sector Review.* UNDP

Sen, Binayak (1995). "Rural Poverty Trends, 1963-64 to 1989" in Hossain Zillur Rahman and Mahabub Hossain (ed) *Rethinking Rural Poverty*. Dhaka.

Sen, Binayak (1996). "Rural Non-Farm Sector in Bangladesh. Stagnating and Residual or Dynamic and Potential? BIDS-World Bank Workshop, Dhaka.

Shamim Hamid(1995). "Gender Dimension of Poverty" in Hossain Zillur Rahman and Mahabub Hossain (ed.): *Rethinking Rural Poverty*, Dhaka.

Sultan Hafiz Rahman (1992). "Structural Adjustment and Macroeconomic Performance in Bangladesh in the 1980s" the Bangladesh Development Studies Task Forces (TF) 1991): Report of *the task forces on Bangladesh Development Strategies for the 1990's.* vol: 1-4, Dhaka.

Westergard Kirstan (1996). "Peoples Emporwement in Bangladesh, NGO Strategies, The Journal of Social Studies. No 72.

World Bank & USAID (1996). *The Strucutre and performance of Bangladesh* Manufacturing 1992", Dhaka.

World Bank (1995). *World Tables 1995.*

World Bank (1996). *Bangladesh. An agenda for Action, Dhaka.*

World Bank (1996). *Bangladesh. Government that works*, Reforming the Public Sector, Dhaka.

World Bank (January, 1990). Bangladesh. Poverty and Public Expenditures: An evaluation on the impact of selected government programs.

World Bank (March, 1992). Bangladesh Selected Issues in External Competiveness and Economic Eficiency.

World Bank (March, 1994). Bangladesh: From Stabilization to Growth.

World Bank (March, 1995) *Bangladesh: Recent Economic Developments and Priority* Reform Agenda Rapid Growth.

World Bank (September, 1994). Bangladesh. Development in a Rural Economy.

World Bank(March 1982). Bangladesh: Recent Economic Development and selected Development Issues.

Yilmaz Kamil and Sona Varma (1994). "Trade Policy Reforms in Bangladesh" Industrial Sector Study Working Paper. South Asia Country Department World Bank.

মুহাম্মদ, আনু (১৯৮৮)। *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল,* ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯২)। *বাংলাদেশের কোটিপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক,* ঢাকাঃ চলন্তিকা প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৩)। *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অনুন্নত বিশ্ব,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব ?* ঢাকাঃ গণ প্রকাশনী।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৬)। *নারী, পুরষ ও সমাজ,* ঢাকাঃ সন্দেশ প্রকাশনী।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
চতুর্দশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৌষ ১৪০৬

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা

মোঃ শফিকুল হক*

Effectiveness of Research Methodology Module in Foundation Training Course. *Md. Shafiqul Haque*

Abstract: *Research Methodology* is one of the important modules in Foundation Training Course (FTC). From this module trainee officers are expected to learn the meanings of research, different methods of data collection and techniques of writing a research report. This article is an attempt to examine whether *Research Methodology Module* is effective or not for the trainee officers of Foundation Training Course. 132 newly recruited officers of different cadres of Bangladesh Civil Service, who participated in the 22nd FTC have been interviewed for this study through a pre-tested questionnaire. Collected data have been analyzed by using simple statistics. The 132 officers who were interviewed have found *Research Methodology Module* effective though some more suggestions are offered by them to make it more pragmatic, practical and effective.

গবেষণা হচেছ এক ধরনের প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে জ্ঞানকে (knowledge) পরিমার্জন/পরিশীলন, যাচাই (verify), আবিস্কার (discover) এবং পরিবর্ধন (develop) করা হয় (তারেক, ১৯৯৩ঃ১২)। সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের মধ্যেই মূলতঃ সামাজিক গবেষণার শুরু (Bert Hoselitz, 1970:14)। সামাজিক গবেষণার ভূমিকা হলো সমাজের বিভিন্ন দল, গোষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দাবী, প্রয়োজন, ইত্যাদিকে উপাত্ত হিসেবে সরকারি সিদ্ধান্তের আলোচ্যসূচীতে পরিণত করা যাতে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং সবসময় কার্যকর থাকে (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৩ঃ৭)। আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য বাস্তব ও সমস্যাকেন্দ্রীক গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ প্রয়োজন। দেশের আর্থ-সমাজিক সমস্যাসমূহের নৈর্ব্যক্তিক ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ ছাড়া কোন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়াও গবেষণার ফলাফল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দিক্‌নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের চাকরির স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ও মৌলিক প্রশিক্ষণ। দেশের উন্নয়ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে নবীন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

* সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বিপিএটিসি।

ক্ষমতা ও বৈশ্লিষক দক্ষতা (analytical skill) উন্নয়নের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের মধ্যে অন্যান্য মডিউলের পাশাপাশি 'গবেষণা পদ্ধতি' মডিউলটি অন্তর্ভূক্ত আছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের ব্রসিউরে বিবৃত গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে (BPATC,1998:29) নিম্নরূপঃ

লক্ষ্যঃ গবেষণার অর্থ (meaning), উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি, গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা।

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীগণকে উপাত্ত সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্ষম করে তোলা।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতায় গবেষণা পদ্ধতি মডিউলে নিম্নলিখিতি ৬টি অধিবেশন অন্তর্ভূক্ত আছে (BPATC, 1998: 29)ঃ

ক) গবেষণাঃ সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ব্যবহার;
খ) উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল;
গ) সমগ্রক, নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি;
ঘ) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল;
ঙ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার;
চ) গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল।

এ ছাড়াও এই মডিউল থেকে প্রাপ্ত তাত্তিক ধারণার ব্যবহারিক অনুশীলন হিসেবে 'মাঠ সমীক্ষা' শীর্ষক আরেকটি মডিউলও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি অন্যতম প্রধান পাঠক্রম। চার মাস মেয়াদী এই পাঠক্রমে গবেষণা পদ্ধতি মডিলটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মডিউল হিসেবে বিবেচিত। কেন্দ্রের মূল্যায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক প্রতিটি বুনিয়াদি পাঠক্রমের নিয়মিত মূল্যায়ন হলেও পাঠক্রমের মডিউলভিত্তিক গবেষণা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পাঠক্রমের সমাপ্তি লগ্নে কর্মস্থলে ফেরার আকাঙ্ক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীগণ যে ভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন তা সবসময় সম্পূর্ণ ও যথাযথ অর্থে নৈর্ব্যক্তিক নাও হতে পারে। তাছাড়া যে কোন পাঠক্রম বা মডিউলের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই। বর্তমান গবেষণায় বুনিয়াদি পাঠক্রমে গবেষণা পদ্ধতি মডিউল প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় কতটুকু কার্যকর হচেছ তা অনুধাবনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণার ফলাফল

আগামী বুনিয়াদি পাঠক্রমের গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি পাঠক্রমের আওতাধীন গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকরিতা অনুধাবনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সফলতা নির্ণয়;

খ) বুনিয়দি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের গুরুত্ব অনুধাবন; এবং

গ) গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন;

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম সীমিত রাখা হয়েছেঃ

ক) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাডার, চাকরিকাল ও Academic Background এর বিন্যাস;

খ) প্রশিক্ষণার্থীদের দাপ্তরিক কাজের সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক;

গ) গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের অন্তর্ভূক্ত ৬টি বিষয়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত;

ঘ) গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণার্থীদের সুপারিশ।

গবেষণা পদ্ধতি

১৯৯৮ সনের আগষ্ট-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে অংশগ্রহণকারী ১৪২ জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলকেই উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে ১৩২ জন প্রশিক্ষর্ণাথীর নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তের জন্য গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের প্রশিক্ষণ শেষে কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রশিক্ষণার্থীকে একটি প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। প্রশ্নপত্র পদ্ধতিতে (Questionnaire Method) প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্নপত্রটি পূরণ করেন। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বই, পাঠক্রম নির্দেশিকা, প্রতিবেদন ইত্যাদি হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে সাধারণ পরিসংখ্যানীয় পদ্ধতি (গড়, মধ্যক, শতকরা হার ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয়েছে। সারণীর মাধ্যমে উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় কেবল প্রশিক্ষণার্থীদের কেন্দ্রে অবস্থানকালীন মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মস্থলে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি মডিউল কতটুকু কী

ভাবে কাজে লাগছে তা জানার কোন প্রচেষ্টা এই গবেষণায় নেই। তাছাড়া গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে কোন উপাত্ত গবেষণার জন্য সংগ্রহ করা হয় নি। সর্বোপরি এই গবেষণার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় সম্পূর্ণ এককভাবে স্বল্প পরিসরে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফলাফল, উপসংহার ও সুপারিশ

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি পাঠক্রমের ১৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীর মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ ৭টি বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস ও একটি নন-ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা। ক্যাডার সার্ভিস গুলো হচেছ গণপূর্ত, টেলিকম, মৎস্য , অর্থনীতি, শুল্ক ও আবগারী, বিচার এবং প্রশাসন। নন- ক্যাডার সার্ভিস হচেছ সংসদ সচিবালয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মৎস্য ক্যাড্যারের কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব সর্বাধিক এবং প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব সর্বনিম্ন। সামগ্রিকভাবে বিশেষায়িত ক্যাডার সার্ভিসে (গণপূর্ত, টেলিকম, মৎস্য ও বিচার) কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা মোট প্রশিক্ষণার্থীর দুই- তৃতীয়াংশ (সারণী১)।

সারণী -১। প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক চাকুরি কালের বিন্যাস

ক্যাডার	চাকুরি কাল (বছর)					মোট
	০-১	১-২	২-৩	৩-৪	৪-৫	
গণপূর্ত	২১ (৯১.৩০)	-	-	-	২ (৮.৭০)	২৩ (১৭.৪২)
টেলিকম	১৬ (১০০.০)	-	-	-	-	১৬ (১২.১২)
মৎস্য	৩৬(৯৪.৭৪)	-	-	-	২ (৫.২৬)	৩৮ (২৮.৭৯)
অর্থনীতি	১৮ (৮৫.৭১)	-	২ (৯.৫২)	-	১ (৪.৭৬)	২১ (১৫.৯১)
শুল্ক ও আবগারী	-	-	১০ (৭১.৪৩)	২ (১৪.২৮)	২ (১৪.২৮)	১৪ (১০.৬১)
বিচার	১১ (১০০.০)	-	-	-	-	১১(৮.৩৩)
প্রশাসন	১ (২৫.০)	২ (৫০.০)	-	-	১ (২৫.০)	৪ (৩.০৩)
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	১ (২০.০)	৩ (৬০.০)	১ (২০.০)	-	-	৫ (৩.৭৯)
মোট	১০৪(৭৮.৭৯)	৫ (৩.৭৯)	১৩ (৯.৮৫)	২ (১.৫১)	৮ (৬.০৬)	১৩২(১০০.০)

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮। (বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার দেখান হয়েছে)

দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি পাঠাক্রমের প্রশিক্ষণার্থীগণ চাকুরিতে নবীন এবং সবার চাকরিকালই ৫ বছরের নীচে। উপরন্তু তিন-চতুর্থাংশের অধিক প্রশিক্ষণার্থীর

চাকরিকাল ০-১ বছর (সারণী১)। প্রশিক্ষাণার্থীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে প্রকৌশল ক্যাডারের (গণপূর্ত ও টেলিকম) কর্মকর্তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রীধারীর সংখ্যাই বেশী। এছাড়া উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী কৃষি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েছেন (সারণী২)।

সারণী - ২ । প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক Academic Background

ক্যাডার	Academic Background						মোট
	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান	কৃষি	আইন	কলা	বণিজ্য	-
গণপূর্ত	২৩ (১০০.০)	-	-	-	-	-	২৩
টেলিকম	১৬ (১০০.০)	-	-	-	-	-	১৬
মৎস	-	-	৩৮ (১০০.০)	-	-	-	৩৮
অর্থনীতি	-	২০ (৯৫.২৪)	-	-	-	১ (৪.৭৬)	২১
শুল্ক ও আবগারী	২ (১৪.২৮)	৬ (৪২.৮৬)	-	-	৫(৩৫.৭১)	১ (৭.১৪)	১৪
বিচার	-	-	-	১১(১০০.০)	-	-	১১
প্রশাসন	২ (৫০.০)	১ (২৫.০)	-	-	১ (২৫.০)	-	৪
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	৩ (৬০.০)	-	-	-	১ (২০.০)	১ (২০.০)	৫
মোট	৪৬ (৩৪.৮৫)	২৭ (২০.৪৫)	৩৮ (২৮.৭৯)	১১ (৮.৩৩)	৭ (৫.৩০)	৩ (২.২৭)	১৩২

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ; দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম; ১৯৯৮ । (বন্ধনীর ভেতর শতকরা হার দেখান হয়েছে)

প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের কর্মস্থলে যে সব কাজের সাথে জড়িত আছেন কিংবা ভবিষ্যতে জড়িত হবেন তার সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক গড় মানের। তবে মৎস্য ও অর্থনীতি ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের সাথে গবেষণা পদ্বতি মডিউলের সন্তোষজনক সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে গণপূর্ত, শুল্ক ও আবগারী, বিচার এবং প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের চাকুরির সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক সন্তোষজনক নয় (সারণী ৩)।

সারণী -৩। বর্তমান চাকুরির সাথে গবেষণা পদ্বতি মডিউলের সম্পর্ক

ক্যাডার	উত্তরদাতার সংখ্যা	সম্পর্ক		
		মান (Score)	গড়	ফলাফল (Median = ৩.৫। ৫.৪এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮-৫.৪ 'সন্তোষজনক' ৪.০ - <৪.৮ ' গড়মান', <৪.০ 'সন্তোষজনক নয়')
গণপূর্ত	২৩	৭২	৩.১৩	সন্তোষজনক নয়
টেলিকম	১৬	৭২	৪.৫	গড় মান
মৎস	৩৮	১৮	৪.৮২	সন্তোষজনক
অর্থনীতি	২১	১০৭	৫.০৯	সন্তোষজনক
শুল্ক ও আবগারী	১৪	৪৫	৩.২১	সন্তোষজনক নয়
বিচার	১১	৩৬	৩.২৭	সন্তোষজনক নয়
প্রশাসন-	৪	৯	২.২৫	সন্তোষজনক নয়
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	৫	২১	৪.২	গড় মান
মোট	১৩২	৫৪৫	৪.১৩	গড় মান

উৎসঃ প্রশ্নপত্র, জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮।

বুনিয়াদি পাঠক্রমের ব্রসিউরে বিবৃত গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের লক্ষ্য অর্জনে সফলতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, টেলিকম ও বিচার ক্যাডার এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় লক্ষ্য অর্জনে আলোচ্য মডিউলটির সফলতা সন্তোষজনক। অবশিষ্ট ৭ টি ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত অনুযায়ী সফলতা গড় মানের। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য অর্জনে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সফলতা গড় মানের (সারণী ৪)।

সারণী -৪। লক্ষ্য অর্জনে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সফলতা

ক্যাডার	উত্তরদাতার সংখ্যা	সফলতা		
		মান (Score)	গড়	(Median = ৩৫। ৫.৪এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮ - ৫.৪ 'সন্তোষজনক' ৪.০ < ৪.৮ 'গড়মান'; < ৪.০ 'সন্তোষজনক নয়')
গণপূর্ত	২৩	১০৮	৪.৭	গড়মান
টেলিকম	১৬	৮০	৫.০	সন্তোষজনক
মৎস	৩৮	১৮২	৪.৭৯	গড়মান
অর্থনীতি	২১	৯৯	৪.৭১	গড়মান
শুল্ক ও আবগারী	১৪	৬৬	৪.৭১	গড়মান
বিচার	১১	৫৩	৪.৮২	সন্তোষজনক
প্রশাসন	৪	১৪	৩.৫	সন্তোষজনক নয়
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	৫	২৪	৪.৮	সন্তোষজনক
মোট	১৩২	৬২৬	৪.৭২	গড় মান

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম,১৯৯৮।

পাঠক্রম নির্দেশিকায় গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের বিবৃত উদ্দেশ্য হচেছ- প্রশিক্ষণার্থীগণকে উপাত্ত সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্ষম করে তোলা। সামগ্রীক বিবেচনায় মডিউলের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীগণের সফলতা সন্তোষজনক। তবে এ ক্ষেত্রে মৎস্য, অর্থনীতি, শুল্ক ও আবগারী এবং প্রশাসন ক্যাডারের প্রক্ষিণার্থীদের সফলতা গড়মানের (সারণী৫)।

সারণী -৫ । গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীদের সফলতা

ক্যাডার	উত্তরদাতার সংখ্যা	সফলতা		
		মান (Score)	গড়	ফলাফল (Median=৩৫। ৫.৪ এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮ - ৫.৪ 'সন্তোষজনক' ৪.০ - < ৪.৮ 'গড়মান' < ৪.০ 'সন্তোষজনক নয়'
গণপূর্ত	২৩	১১৭	৫.০৮	সন্তোষজনক
টেলিকম	১৬	৮১	৫.০৬	সন্তোষজনক
মৎস	৩৮	১৮৪	৪.৮৪	সন্তোষজনক
অর্থনীতি	২১	৯৯	৪.৭১	গড় মান
শুল্ক ও আবগারী	১৪	৬৫	৪.৬৪	গড় মান
বিচার	১১	৪৯	৪.৪৫	গড় মান
প্রশাসন	৪	১৯	৪.৭৫	গড় মান
নন-ক্যাডার(সংসদ সচিবালয়)	৫	২৫	৫.০	সন্তোষজনক
মোট	১৩২	৬৩৯	৪.৮৪	সন্তোষজনক

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮।

সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কাজের সাথে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সম্পর্ক গড়মানের হলেও বুনিয়াদি পাঠক্রমে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের সন্তোষজনক গুরুত্ব চিহ্নিত হয়েছে। তবে শুধুমাত্র শুল্ক ও আবগারী ক্যাডারভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় বুনিয়াদি পাঠক্রমে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের গুরুত্ব গড় মানের (সারণী৬)।

সারণী -৬। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের গুরুত্ব

ক্যাডার	উত্তরদাতার সংখ্যা	গুরুত্ব		
		মান (Score)	গড়	ফলাফল (Median = ৩৫। ৫.৪ এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮ - ৫.৪ 'সন্তোষজনক' ৪.০- <৪.৮ 'গড়মান' <৪.০ 'সন্তোষজনক নয়'
গণপূর্ত	২৩	১২২	৫.৩০	সন্তোষজনক
টেলিকম	১৬	৮৫	৩.৩১	সন্তোষজনক
মৎস	৩৮	২০৫	৫.৩৪	সন্তোষজনক
অর্থনীতি	২১	১১৮	৫.৬২	অত্যন্ত সন্তোষজনক
শুল্ক ও আবগারী	১৪	৬৫	৪.৬৪	গড় মান
বিচার	১১	৫৭	৫.১৮	সন্তোষজনক
প্রশাসন	৪	২১	৫.২৫	সন্তোষজনক
নন-ক্যাডার(সংসদ সচিবালয়)	৫	২৭	৫.৪	সন্তোষজনক
মোট	১৩২	৬৯৮	৫.২৯	সন্তোষজনক

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম,১৯৯৮।

গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের মোট ৬ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত । বিষয়গুলো হলো- গবেষণাঃ সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ব্যবহার; উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল; সমগ্রক, নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি; প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল; উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার; এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল। সামগ্রিক বিবেচনায় গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের আওতাধীন উপর্যুক্ত ৬টি বিষয়ের কার্যকারিতা সন্তোষজনক (সারণী ৭)

সারণী -৭ । গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমুহের (Topics) কার্যকারিতা

বিষয়সমূহ	কার্যকারিতা (N-১৩২)		
	মান (Score)	গড়	ফলাফল (Median - ৩৫। ৫.৪ এর বেশী 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮-৫.৪' 'সন্তোষজনক';৪.০-<৪.৮' গড়মান'; <৪.০' 'সন্তোষজনক নয়')
১) গবেষণাঃ সংজ্ঞা,প্রকার ও ব্যবহার	৬৭০	৫.০৭	সন্তোষজনক
২) উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল	৬৭৬	৫.১২	সন্তোষজনক
৩) সমগ্রক, নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি	৬৫৭	৪.৯৮	সন্তোষজনক
৪) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল	৬৮২	৫.১৭	সন্তোষজনক
৫) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার	৬৯৫	৫.২৬	সন্তোষজনক
৬) গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল	৬৮১	৫.১৬	সন্তোষজনক
মোট	৪০৬১	৫.১৩	সন্তোষজনক

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮।

মডিউলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের কার্যকারিতা বিশ্লেষণে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক মতামত অনুযায়ী, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে কার্যকারিতা গড় মানের। সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের মতে 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল' এবং 'উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার' শীর্ষক বিষয় দুইটির কার্যকরিতা সন্তোষজনক। অবশিষ্ট চারটি বিষয়ের কার্যকারিতা গড় মানের। প্রশাসন ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় 'উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল' 'সমগ্রক, নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি' ও 'প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কৌশল' শীর্ষক বিষয় তিনটির কার্যকারিতা গড় মানের। অবশিষ্ট বিষয়সমূহের কার্যকারিতা সন্তোষজনক এবং অত্যন্ত সন্তোষজনক। শুল্ক ও আবগারী ক্যাডারর্ভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিবেচনায় 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন শীর্ষক কৌশল বিষয়ের কার্যকারিতা গড় মানের এবং অবশিষ্ট পাঁচটি বিষয়ের কার্যকারিতা সন্তোষজনক (সারণী ৮)।

সারণী-৮। গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের (Topics) কার্যকারিতা

(ক্যাডার ভিত্তিক মতামত)

ক্যাডার	বিষয়ভিত্তিক কার্যকারিতা						
	গবেষণাঃ সংজ্ঞা, প্রকার ও ব্যবহার	উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল	সমগ্রক নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল	উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ঃ শ্রেণীকরণ সারণী করণ ও চিত্রের ব্যবহার	গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন কৌশল	মোট
	ফলাফল (Median – 35)। ৫.৪ এর বেশী ' অত্যন্ত সন্তোষজনক' ৪.৮-৫.৪' সন্তোষজনক ; ৪.০-<৪.৮' গড়মান; <৪.০' সন্তোষজনক নয়'						
গণপূর্ত	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
টেলিকম	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	অত্যন্ত সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
মৎস	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
অর্থনীতি	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
শুল্ক ও আবগারী	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	গড় মান	অত্যন্ত সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
বিচার	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক		সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
প্রশাসন	সন্তোষজনক	গড় মান	গড় মান	গড় মান	অত্যন্ত সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক
নন-ক্যাডার (সংসদ সচিবালয়)	গড় মান	গড় মান	গড় মান	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	গড় মান	সন্তোষ জনক
মোট	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষজনক	সন্তোষ জনক	সন্তোষ জনক

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম,১৯৯৮।

গবেষণা পদ্ধতি মডিউলে সংযোজনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীগণ যেসব নতুন বিষয়ের প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে অনুকল্প প্রমাণকরণ, প্রশ্নপত্র, প্রণয়ন, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে কম্পিউটার ব্যবহার এবং কালীন সারি বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য।

প্রশিক্ষণার্থীগণ গবেষণা পদ্ধতি মডিউলে মানোন্নয়নের জন্য যেসব সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫টি সুপারিশ হচ্ছে (সারণী-১০) ঃ অনুশীলনী অধিবেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি (৪৩ জন), অধিবেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি (২৮ জন), প্রমশ্নপত্র প্রণয়নের উপর অনুশীলন অধিবেশন (২৩ জন), লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে টার্ম পেপার (২০ জন) ও প্রতিবেদন প্রণয়নের উপর অনুশীলনী অধিবেশন (১৩ জন)।

সারণী-১০। গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণার্থীদের সুপারিশ

প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
১. প্রশ্নপত্র প্রণয়নের উপর অনুশীলনী অধিবেশন	২৩	১৭.৪২
২.প্রতিবেদন প্রণয়নের উপর অনুশীলনী অধিবেশন	১৩	০৯.৮৫
৩. অধিবেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি	২৮	২১.২১
৪. অনুশীলনী অধিবেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি	৪৩	৩২.৫৭
৫. লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে টার্ম পেপার	২০	১৫.১৫

উৎসঃ প্রশ্নপত্র জরিপ, দ্বাবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, ১৯৯৮।

গবেষণা পদ্ধতি মডিউলটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ মডিউল হিসেবে বিবেচিত। দেশের আর্থসামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও এর সমাধানের জন্য বাস্তব ও সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণার কোন বিকল্প নেই। দেশের উন্নয়ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে নবীন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও বৈশ্লিষক দক্ষতা (analytical skill) উন্নয়নের ক্ষেত্রেও 'গবেষণা পদ্ধতি' মডিউলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গবেষণা পদ্ধতি মডিউলের কার্যকারিতা সন্তোষজনক হিসেবে চিহ্নিত হলেও এর মানোন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। মডিউলটির মানোন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে এর কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারেঃ

১) 'অনুকল্প প্রমাণকরণ', 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে কম্পিউটার ব্যবহার' এবং 'কালীন সারি বিশ্লেষণ' এই ৩টি বিষয় সংযোজন।

২) 'সমগ্রক, নমুনাও নমুনায়ন পদ্ধতি', 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কৌশল', এবং 'উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ শ্রেণীকরণ, সারণীকরণ ও চিত্রের ব্যবহার' - এই তিনটি বিষয়ের জন্য অন্ততঃ একটি করে অনুশীলনী অধিবেশনের ব্যবস্থা করা।

তথ্য নির্দেশিকা

আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ (১৯৯৩)। উন্নয়নে সামাজিক গবেষণার ভূমিকা। নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও আ,ক,ম, মাহবুবুজ্জামান (সম্পাদিত)। *সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি।* ঢাকাঃ গবেষণা ও উপদেশনা বিভাগ, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার,ঢাকা।

তারেক, মোহাম্মদ (১৯৯৩)। গবেষণা সংজ্ঞা, নক্‌শা, পদ্ধতি ও প্রকারভেদ। নাসির উদ্দীন আহমেদ ও আ.ক,ম, মাহবুবুজ্জামান (সম্পাদিত)। *সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি।* ঢাকাঃ গবেষণা ও উপদেশনা বিভাগ, বাংলাদেশ লোক- প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

Bert Hoselitz (ed.) (1970). *A Reader's Guide to Social Sciences.* New York: The free press.

BPATC (1998). *Course Guidelines.* Twenty- Second Foundation Training Course. Dhaka : Bangladesh public Administration Training Center, Savar Dhaka.

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 14. December 1999. Pouse. 1406

Looking BTMC Through World Bank Mirror

Md. Tofazzel Hossain*

Abstract: The shift of state policy toward market economy after the political change of 1975 coupled with rampant corruption, inefficiency and mismanagement led to the foundation of privatization beginning in 1977. During last 22 years 51 textile mills had been privatized. Now BTMC has been continuing its control over 35 largest textile mills of the country and incurring loss and more loss. The commercial banks were unwilling to grant further loans to BTMC as its unpaid accumulated loon stood at Tk.254.88 crores on 31 March, 1997. The government also gave loons of Tk.452.40 crores. But inspiUe of that BTMC's financial crisis rose to the climax in 1997. The World Bank prescribed different sets of recommendations to salvage the drowning BTMC mills and to circulate blood in the textiles sector of Bangladesh. But those are also going to flop. What panacea would help resurrect it from inevitable degeneration is to invent now.

As would be expected, the basic goal of all development plans in Bangladesh is an attempt at sustainable development through poverty alleviation programmes having first priority. How can poverty be reduced? The simple answer is- by generating more productive jobs and investments inhuman development . The means of getting there is, however, not so simple. The biggest problems would appear to be low employment and low labour productivity. or inversely, the high underemployment and low growth rate ranging around 43% and 02% respectively. It is a vicious impediment. Within these macro- economic frameworks, the textile sector had the potential to be a catalyst and a trigger factor for a phenomenal transformation and metamorphosis in Bangladesh economy. With a population of 120 million, in an of 147,000sq. km, Bangladesh was ideally poised for a thrust in the development of the textile industry. The government of Bangladesh also declared textile a " Thrust Sector" in 1992, but so much for. It is true that presently textile sector contributes about 65% of total export earnings of the country and accounts

* MDS, BPATC

for 35 lac or 45% of the total industrial employment. About 05%of GDP originate and nearly 45% of manufacturing value added also comes from textiles. But all these positive signs are depicted by the contribution of export- oriented Ready-Made Garments (RMG) and private sector textile mills. There were 68 spinning, 15 rotor and 1126 weaving mills in the country with an installed capacity of 1390000 spindles, 37200 rotor heads and 4027 looms with a production capacity of 29383000 kgs. yarn and 19481000 meters of fabrics respectively by the end of 1995. The RMG industry first appearing in 1997-98 with 9 enterprises having an annual capacity of 8.01 million pieces and export earning of TK. 1.019 million, made most spectacular growth of 1830 enterprises with an annual production capacity of 1198 million pieces and export earnings of TK 90.399 million (US$ 2.23 billion) in 1994-95. But our present study will concentrate only on public sector textile mills run under the supervision and control of BTMC.

2. **History of Textile Industry and BTMC :** Textile sector has as many as 36 product-centers and the industry comprises at least four major processes representing four sub-sectors; namely: - Spinning, Weaving, Dyeing & Finishing and Ready Made Garments (RMG). The blanched development of all the sub-sectors is a pre- requisite for healthy growth of the industry as a whole. But the analysis of last 45 years commencing from 1947 (as shown in Table–1) reveals an unbalanced growth of the four sub-sectors, having been almost no growth in weaving and dyeing – finishing sub- sectors whereas considerable growth took place in spinning sub–sector. RMG sub – sectors experienced a delayed but very fast mushroom growth.

Table –1: Growth of Different Sub-Sector of Textile Industry (1947-92)

Sub-Sector	1947	1970	1972	1982	1992
1. Spinning					
a. Mills	9	45	51	59	113
b. Spindle	110	750	830	1094	2124
2. Weaving					
a. Mills	9	25	25	25	26
Looms	2717	7000	7000	7000	7179
b. Specialized Textile & Power loon					
i) Units	-	-	36	136	1114
ii) Looms	-	-	820	2351	29406
c. Handloom Units Looms	240	296	304	389	514
d. Knitting Hosiery Units					
i) Export Oriented	-	-	-	1	195
ii) Local	105	140	141	281	335
e. Silk					
i) Factory	-		-	2	29
ii) Loom	-	-	-	80	580
iii) Silk Loom	-	-	-	3400	9289
		-			
3. Dyeing & Finishing					
i) Mechanized Units		7	7	22	94
ii) Semi-Mechanized Units		-	-	119	203
4. RMG Units				74	1481

Source : MIS Report, TSMU, M/O Textiles

Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) was created in 1972 and initially 72 state owned enterprises (SOE) were put under it. Subsequently two more taken over mills were placed and 12 new mills were established under the supervision and control of BTMC. But after 1975 the government policy was changed. Then during 1977-82 government withdrew capital

from 03 mills handed over ownership of 05 specialised mills to its former owners or shareholders, sold out assets and properties of 03 mills through liquidation process and entity of 03 mills were deleted from the schedule as on tangible property was found anywhere within the country (annex-1). Thereafter 30 mills were divested during the period from 1983-87 (annex-2). Moreover, Sharmin Textile Mills (15-12-94), Madaripur Textile Mills* (15-12-94), Kishoregong Textile Mills* (29-12-94), Kohinur Spinning Mills* (15-2-95), Zofine Fabrics Ltd. (22-2-95), Barisal Textile Mils*(28-5-95) and Royal Textile Mills (24-11-97) have been privatized in the dates shown against each of them.

Now BTMC has 35 mills (annex-3) under it amongst which only spinning section of 19 are running and rest 16 are laid off. All the mills under BTMC were running on loss for a long and the quantum of loss have been increasing year after year as shown in Table-2.

Table-2 : Productipn and Finacial Performance of BTMC

Description	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1. production							
a. Yarn Million kg	42.5	42.2	34.006	17.088	17.003	14.903	6.790
b. Cloth Million Mtr	47.4	47.8	33.765	14.139	5.170	3.101	0.840
2. Sales Revenue Million Tk	4,655.9	3,179.3	3,189.6	2,361.7	2,379.6	1,700.0	975.0
2. Cost of Sales Million Tk.	4,977.1	3,264.8	4,053.4	3,494.8	3,202.2	2,754.0	2,236.0
3. Operating profit/(Loss) Million Tk.	(321.2)	(85.5)	(863.8)	(1,133.1)	(822.6)	(1,054.0)	(1,261.0)
5. Net profit/ (Loss) Million Tk	(583.9)	(434.2)	(1,354.7)	(1,538.7)	(1,192.0	(1,355.1)	(1,632.8)

Source: BTMC/TSMU, M/O Textiles.

Loans with NCBs rose to Tk. 254.88 crores on 31 March 1997 and the banks were unwilling to grant further loans since BTMC was paying neither principal nor the interest. The government has given loan advance of Tk. 452.40 crores. The government has also given entire amount to implement reduction of over staffing burden and DSL on long turm loan. Inspite of all those financial help BTMC was quite unable to stand by its own foot.

3 **The World Bank Prescriptions :** The World Bank had made five sets of recommendations to salvage the drowning textile industry of Bangladesh. The prescriptions are-

(A) Organization Aspects

- Eliminate Ministry of Textile
- Downsize BTMC
- Increase Autonomy
- Close-down non-viable mills
- Privatize all mills within three years
- Experiment with management contracts, monetary incentives in some mills
- Examine employees stock ownership programmes (ESOP)
- Privatize BTMC's sales and display centres
- Downsize Handloom, Cotton and Sericulture Boards
- Disseminate information about GOB's privatisation efforts
- Wage policy out of political arena
- Rationalize wage-price relationships
- In overstaffed mills, implement wage freeze, install "Golden Handshake" coupled with re-training programmes.

(B) Production and Thchnology Asspects

- Improve quality of yarn/fabric production

- Piecemeal investment, BMR are unproductive, go for new mills with new equipment, use existing buildings of some modern mills.
- Use back-up generation in mills
- Train workers to expand skills
- Improve, expand textile finishing units
- Study impact of dyeing/printing on environment.

(C) Markets and Linkages

- Mills should not be considered units. They should be considered as sales and profit centers.
- Production should be determined by geared to demand
- Prices should be determined by market forces
- Develop ties with foreign buyers of fabrics
- Improve market analysis domestically and internationally
- Create fabric banks geared to market demand
- Improve marketing training through technical assistance
- Most important move- increase competitiveness, price, quality of fabrics through consistent available of yarn
- Establish liaison councils between RMG and the textile mills to foster cooperation
- Change inward-looking to expert-oriented attitudes
- Create lines of credit duty free status and bonded warehouse facilities to encourage and facilitate exports

(D) Financial Issue

- Mill-by-Mill restructuring to determine their financial condition and the most appropriate options. This individualized process should lead towards privatization.
- If analysis indicates that a mil has no chance of viability, shut it down and liquidate land, facilities and equipment.

- Restructuring should not only be done for public sector mills, but also for private sector mills.
- International donors should provide financial assistance and technical assistance .
- Rationalize this sub-sectors debt burden by looking at options such as:-
  a) Converting debt to equity
  b) Converting to interest-free of soft loans.
- Write-offs
- Design a "conditional debt forgiveness programme [CDFP] that writes-off the non-sustainable portion of the debt.

(E) Assistance Policies

- Design/implement an integrated set of policies to create climate including private sector development
- Identify and remove procedural, regulatory bottlenecks
- Further liberalise trade policy
- Aim at a flat rate of tariff on fibres 15% eventually. Reduce protection
- Introduce a well-devised system of duty drawbacks at flat rates for textile products, which should incorporate duty on capital items
- Liberally provide bonded-Warehouse facilities
- Unless duty drawback system covers capital items, allow:
  a) Provisional duty-free imports of spare parts to intending exporters
  b) Duty-free imports of capital machinery.

4. **Anecdotes of the Prescriptions :** Banking on only the stimulating pills, as can be picked from the prescription

package, BTMC started to exploit the government for funds in all respect including salaries/wages of the employees. At one point BTMC started to persuade to gain over a big-push in which Tk. 157.54 crore interest-free loan on working capital head was sought for and perjured that it would never come back to the government for any sort of finance. Let's have an acid test of BTMC's most prospective proposal in the World Bank laboratory (prescriptions):

(A) Organizational Aspects :

Most of the recommendations under this head have been exercised in some form of other under sincere and serious efforts of the Ministry of Textiles elimination of which could rather rouse retarding forces to impede progress. The Ministry tried its best to downsize BTMC ensuring funding for golden handshake and changing organogram on the light of Nurannabi Committee report which has provision of drastic cut of manpower. All the more losing mills, comparatively more losing weaving section of all the mills and almost the display centres have been closed down and now only spinning section of 19 mills are running. The in house analysis entailed running BRMC with not more than 09 mills which have a bleak possibility of running on or above break-even. All the rest of the mills would be sold out today or tomorrow. A list of 16 mills is laying with the privatization board since its inception in 1993. The Ministry of Textile reminded time and again to expedite sale.

Privatization board itself has been strengthened reconstituting it with politico-business elites of the country headed by a Minister of State and publicizing arguments in favour of privatization wide open through news papers, seminars, symposiums, etc. Inspite of that PB could not sale even a second mill during last six years proving the recommendation of privatizing all the mills within three years altogether a utopian thought although. Wage

policy out of political intervention is not practicable at the context prevailing therein but nevertheless wage rate is infact not higher than the rationale. However, wage-price relationship could not be established mainly due to inefficient man-machine phenomena. BRMC is undergoing experiment of contract-out business method initially under its own management. The government have accepted the recommendation of a high powered committee, constituted under the chairmanship of Finance Minister that the Employees stock Ownership Programmes (ESOP), far more liberal than that of USA, will be undertaken to hasten fruitful privatization. The programme is like that the workers and staff of a saleable SOE will form a company to which government owned shares will be transferred free of cost and encumbrances, 1.½% stamp duty payable on transfer document will be exonerated by executive order of the government, company has to take the responsibly to pay long-term loan (if any) but in such case sufficient repayment time will be given and exoneration of penal interest on it will be considered in case it is inputted before transfer of the ownership. The workers will be given all financial benefits by the government like that of a worker going on volunteer retirement under golden handshake programme and that will from initial capital of the company. Moreover, they will be entitled to bank loan, issue of new shares, etc.

BTMC was given full autonomy of running business affairs of the corporation itself and it was also forced to extend maximum possible autonomy to the individual mills to run their business independently during 1995-97. But the result was quite negative. For example all the mills were allowed to purchase raw materials and sale yarn and fabrics at their own. But not a single mill could improve sales position. A very handful of mills could arrange purchase of raw cotton among which Sunderban Textile Mills, the latest and most prospective among the BTMC's lot, did it under rampant corruption which resulted suspension of 14

employees including Chief executive (GM) and labour leaders. Ultimately the GM lost his job but at the cost of the mill, the mill lost its prospect forever as it was hardly possible to overcome the financial stroke occurred due to that corrupt purchase of raw cotton. Hence, the recommendation to increase autonomy in excess of what it deserves is nothing more than a misdemeanour.

(B) Production and Technology Aspects :

It is well accepted that improvement of product quality has nothing to controverse. But how that could be done? True that quality ray material can improve quality a lot. But now without modern machinery/technology and skilled manpower only raw material would not materials the dream. The table 1 & 3 below will show the machine condition to understand how much and how far quality and quantity are expected from BTMC, BMRE of the existing mills, as was understood from a study of the Ministry of Textile in 1995, might require Tk. 5250 million (Tk. 3150 million for 45 spinning mills, 600 million for 6883 loons of 24 weaving mills and 1500 million for 75 mechanized dyeing & printing units).

There is no denying that BMRE is unproductive for BTMC machineries. At the same time going for new mills and new equipments would require so much money which the BTMC would neither manage itself nor the government should provide finance on this stage of out privatization. Technology-knowing stubborn personnel are leaving BTMC but worn-out stabbles are not. Private dyeing/printing/finishing units are making good profit whereas BTMC's have an opposite picture. Moreover, to meet the demand gap shown in Table-4 and estimated investment of Tk. 101, 089 million by the year 2000 and Tk. 205,920 million by the year 2005 would be required as has projected in Table-5 But how Bangladesh could get so much money?

Table-3: Capacity Profile

Sl. No.	Name of Mills	Installed Capacity		Monthly Average Capacity Utilized (last 5 months)		Highest Capacity be utilized with normal minor repairs		Highest Capacity could be utilized by BRMR		Capacity Utilization %	
		Spindles	Looms	Spindles	Looms	Spindles	Looms	Spindles	Looms		
1	Amin Textile-1	18,400		1,217		16,076		16,500		87% 94%	91%
	Amin Textile-2	25,088		5,815		23,500		23,500			
2	Bengal Textile-1	17,296		3,225		16,085		16.085		93% 91%	92%
	Bengal Textile-2	25,088		6,750		22,828					
3	Dost Textile	20,000		3,502		18,200				91%	91%
4	Danwani Textile	25,056		5,312		22,550		22,550		90%	90%
5	Dinajpur Textile	25,056		4,999		22,550		26,870		90%	90%
6	Rajshahi Textile	25,056		362		20,045		20,045		80%	80%
7	Rangamati Textile	18,576		5,447		17,280		17,280		93	93%
8	Sundarban Textile -1	24,960		4,372		22,464				90% 90%	90%
	Nilkamal-2	14,400		4,337		12,960					

Table-3: Capacity Profile (Contd._)

Sl. No.	Name of Mills	Installed Capacity		Monthly Average Capacity Utilized (last 5 months)		Highest Capacity be utilized with normal minor repairs		Highest Capacity could be utilized by BRMR		Capacity Utilization %	
		Spindles	Looms	Spindles	Looms	Spindles	Looms	Spindles	Looms		
9	Vilika Woollen – spg.	3,200	40	482	10	1,310				41%	41%
10	Ahmed Bawani	33,116		2,571		29,804				90%	90%
11	Chisty Textile	18,384		1,167		16,545		16,546		90%	90%
12	Kohil Textile	17,728		1,503		15,000		15,000		85%	85%
13	Orient Textile	13,624		3,745		11,216		12,824		82%	82%
14	Quaderia Textile	16,824		3,680		16,824				100%	100%
15	R.R Textile	31,400	250	3,395	26	28.260	148	28,260		90%	90%
16	Tangail Cotton	26,153		4,364		23,802				91%	91%
17	Sylhet Textile	25,065		3,276		23,553				94%	94 %
18	Magura Textile	25,056		1,082		22,500				90%	94%
19	Kurigram Textile	12,528		1,930		11,029				88%	44%
	Total	**462,045**	**290**	**12,533**	**36**	**414,331**	**148**	**215,460**			

Table-4: Demand and Local Production of Yarn

Year	Total Demand	Production (in million kg.)					Local Producti on as % of Tatla Demand
		Public Sector Mills	%	Private Sector mills	%	Total	
1990-91	248	42.50	48.5%	45.10	51.5%	87.60	35.3%
1991-92	288	42.20	41.4%	59.80	58.6%	102.00	35.4%
1992-93	330	34.01	42.5%	45.99	57.5%	80.00	24.2%
1993-94	368	17.09	27.0%	46.11	73.0%	63.20	17.2%
1994-95	467	17.00	17.6%	79.50	82.4%	96.50	20.7%
1995-96	503	14.90	13.2%	98.10	86.8%	113.00	22.5%
1996-97	542	06.88	05.9%	109.92	94.1%	116.8	21.5%

Table-5: Estimated Investment Requirment in Major Textile Sub-Sectors.

Sub-sector	2000		2005	
	Units	Investment	Units (Miln. Tk.)	Investment (Miln. Tk.)
Spinning	146	58,400	389	155,600
Weaving	109	21,800	194	38,800
Dyeing & Finishing	199	19,400	388	10,800
RMG	1647	989	1200	1,720
Total		101,089		205,920

Assumption: (a) Annual production capacity of one spinning mills of 25,0 Spindles will be 3.0 million kg. investment cost of Tk. 400 million. (b) Annual production capacity of 300 shuttle or 120 shuttles weaving unit will be 10.0 million meters with investment cost of Tk. 200 million. (c) Annual production capacity of dyeing & finishing unit will be 10.0million metres with investment cost of Tk.100 million. (d) Annual production capacity of an RMG unit will be of 0.675 million metres/0.450 million pieces with investment cost of Tk.100 million.

Source: TSMU/ministry of Textiles

(C) Market and Linkages :

These recommendations are important for textile sector as a whole, specially recently buit up export oriented textile mills and RMGs but none of them is at all applicable to BTMC mills because of the fact that both yarn and cloths produced in BTMC mills are sold in values much lower than of production cost and even then finished products godown in becoming fat and more fat day by day.

The table-4 above will show that in years 1990-91 to 1996-97 local production of yarn could meet 17.2% to 35.4% of the demand, rest are met either by import or by smuggling from neighboring countries but yarns produced by BTMC mills could not be sold without push and some sort of dumping under compulsion. A study of 27 best BTMC mills and 90 private mills showed that before 1970 all the (BTMC 22 + Private 23)= 45 mills would produce very low quality yearn; in 1972-83 all the (3 + 27)= 30 mills would produce low quality yarn, in 1983-90 all the (2+11)=13 mills would produce yarn suitable for local requirement but not exportable, 1990-91 only 08 mills in private sector started to produce export quality yarn and number of such private mills increased to 21 in 1991-95. No. BTMC mills even could produce a single mil.gm/mil.mtr. Yarn/fabric which stand equal to international standard. Bangladesh always advocates for its chief labour which even cannot stand competitive because of inefficiency. The world bank report (1995) p 12) shows that unit labour cost per kg. Yarn in Bangladesh is $ 0.46 whereas it is $ 0. 19, 0.15 and 0.53 respectively in neighboring Srilanka, India and Pakistan respectively. Their productivity kg/worker is 3175 and 2299 compared to only 1699 in Bangladesh. In the year 1995 cost of labour per kg yarn and per mtr. cloth in BTMC mills was Tk. 30 and 27.81 compared to Tk. 11.51 and Tk.2.32 respectively in the private sector mills. So no policy could heal BTMC's headache in respect of marketing its products.

(D) Financial Issue :

Let's study financial position of BTMC's 19 running mills. What we see? The mills in the FY 1994-95, 1995-96 and 1996-97 produced yarn 140.15, 123.19 and 58.87 lac kgs; sold out 118.39 and 43.85 lac kgs. respectively and incurred loses of Tk. 51.33 Tk. 77.13 and Tk. 106.09 crores respectively; cumulative loss being Tk. 314.14 crores and shortage of working capital was Tk. 204.70 crores as per balance sheet dated 31.03.97 . The attainable programme analysis in table-6 shows that 11 mills have their break-event point on or below 100%, rest 08 mills being above 100% demand immediate closure. Table-7 reveals that 19 mills have got Tk. 227.70 crores long term loans, Tk. 25.49 crores short-term loans and Tk. 26.34 crores accrued yearly interest on loans having caused high capital cost. Total current assets, current liabilities and net working capital shortage of the 19 mills are Tk. 116.10, Tk. 320.80 and Tk. 204.70 crores respectively which indicates acute liquidity crisis of the mills. Now if wiring capital needs are worked out on the assumption that (a) work-in-process is one kg/spindle, (b) sales time- one month, (c) raw materials stock – 04 months, (d) stores & spares – 03 months production demand, (e) other costs for one month, (f) all transaction will made on cash payment and (g) highest established machine –capacity will be utilized; which has been done in Table-8 knowing fully well that in reality these are neither practicable nor attainable. But if that were not done the mercury would exceed the range of barometer and we could not further.

However, it is revealed from table-8 that capital requirement to keep 19 mills running is Tk. 137.28 crores and for 11 mills having break-even on or below 100% is Tk. 87.19 crores. It is further found that if working capital is supplied at the prevailing 14% rates the yearly interest o 11 viable mills will stand Tk. 12.21 crores and if this capital cost is added break even point of those 11 mills rise

to 89%, 88%, 93% , 92%, 105%, 110%, 77%, 83%, 136% and 136% respectively. Now 04 more mills will be proved non-viable on financial point. After that if this figures are compared with table-3 (capacity profile) it will be seen that Dost Textile, Darwani Textile, Valika Woolen and Orient Textile have break even at 93%, 92%, 77% and 90% respectively, but as machine condition of those mills cannot allow them to run above 91%, 90%, 41% and 82% respectively, these four mills cannot be viable on technical view point. Rest 03 mills only are found viable, which makes, a Corporation like BTMC itself no-viable. Hence, question of financial assistance like that of converting debt into equity, managing interest-free soft loan and write-off or debt; all these will be futile exercise for

BTMC mills and will only increase financial burden to the poverty ridden illclad tax payers of the country. Financial experts would suggest that, liquidation or privatization will be the best possible solution and since privatization is not a easy task, rather would take longer time, it will be better to shut down or lay-off just now all the BTMC mills, but only 03 awaiting privatization. But how far it will be practicable on social context?

(E) Assistance Polices :

All these policies have been designed and implemented in Bangladesh including trade liberalization, reduction or even elimination of tariff on raw materials, chemicals, accessories, machineries, etc. bonded-warehouse and duty drawback systems have also been introduced extensively specially for RMG sectors. Privet sector growth has also been incorporated to the priority aspect in the Textile Policy' 95. However, none of them except that of identifying and removing procedural, regulatory bottlenecks are applicable to public sector textile, i.e. BTMC. And as these policies and tasks are not very much related to our present topic of study we should not waste time in discussion much about it.

Table-6: Attainable Programme to run the Mills Under BTMC Atbreak Even profit as on 31-05-97

Name of Mills	Annual Produc-tion Capacity	Prod Target	Variable cost	Fixed Cost	Total unit cost (Taka)	Total Fixed (lac Tk.)	Total cost (fixed) & variable)	Sales Proceed		Profit/ (loss)	Contri bution Margin	Break even Point (Qty)s	% of Break even point of capacity
								Per unit	Total in Lac Tk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14%
1 Amin Textile-1	12.85	11.70	81.11	32.88	113.99	384.70	133.68	130.34	1524.98	191.30	49.23	7.81	61%
Amin Textile-2	22.86	21.72	76.68	35.49	112.17	770.84	2436.33	116.30	2626.04	89.70	39.62	19.46	85%
2 Bengal Textile-1	14.75	12.91	93.78	40.16	133.94	518.47	1729.17	131.79	1701.41	(27.76)	38.01	13.64	92%
Bengal Textile-2	22.86	18.34	87.05	40.10	127.15	735.43	2331.93	127.62	2340.55	(125.26)	40.57	18.13	79%
3 Dost Textile	17.89	16.28	89.41	33.59	123.00	546.85	2002.44	123.48	2010.25	7.81	34.07	16.05	90%
4 Darwani Textile	20.46	18.79	81.61	27.80	109.41	522.36	2055.81	114.24	2146.57	90.76	32.63	16.01	78%
5 Dinajpur Textile	17.93	15.96	84.20	32.58	116.78	519.98	1863.81	116.78	1863.81	0.00	32.58	15.96	89%
6 Rajshahi Textile	17.58	15.96	75.18	30.54	105.72	487.42	1687.29	103.30	1696.55	9.26	31.12	15.66	89%
7 Rangamati Textile	14.64	13.00	92.11	43.22	135.33	561.86	1759.29	128.70	1673.10	(86.19)	36.59	15.36	105%
8 Sundarban Textile -1	22.56	20.53	78.39	34.31	112.70	704.38	2313.73	117.87	2419.87	106.14	39.48	17.84	79%
Nilkamal-2	16.40	14.76	82.36	32.07	114.43	473.35	1688.99	117.68	1736.96	47.97	35.32	13.40	82%
9 Valika Woolen-Spg	1.07	0.86	268.96	84.58	353.54	72.74	304.04	412.38	354.65	50.60	143.42	0.51	47%
Vilika Woollen-Wvg	1.01	0.66	151.71	83.49	235.20	55.10	155.23	198.03	130.70	(24.53)	16.32	1.19	118%
10 Ahmed Bawani-Spg	22.38	20.14	81.41	29.23	110.64s	588.69	2228.29	93.56	1884.30	(343.99)	12.15	48.45	216%
Ahmed Bawani-Wvg					132.62								130%
11 Chisty Textile	12.56	10.68	100.63	31.99	127.64	341.65	1416.38	121.61	1298.79	(117.59)	20.98	16.28	
12 Kokil Textile	10.21	8.53	98.22	29.42	132.92	250.95	1088.77	121.64	1037.59	(51.18)	23.42	10.72	105%
13 Orient Textile	10.94	9.44	103.99	28.93	136.26	273.10	1254.76	135.53	1279.40	24.64	31.54	8.66	79%
14 Quaderia Textile	13.67	12.93	90.12	46.14	118.79	596.59	1761.84	125.37	1621.03	(140.81)	35.25	16.92	124%
15 R.R Textile-Spg	23.54	21.19	91.91	26.88	118.79	569.59	2517.16	109.10	2311.83	205.33	17.19	33.13	141%
R.R. Textile-Wvg	29.15	17.20	14.02	8.86	22.88	152.39	393.54	19.80	340.56	(52.98)	5.78	26.37	90%
16 Tangail Cotton	17.73	16.26	84.08	31.62	115.70	514.14	1881.28	113.73	1849.25	(32.03)	29.40	17.34	98%
17 Sylhet textile	19.53	18.79	82.16	32.01	114.17	601.47	2145.25	116.56	2190.16	44.91	31.44	17.48	90%
18 Magura Textile	18.56	16.70	89.75	45.52	135.27	760.18	2259.01	121.19	2023.87	(235.14)	35.95	24.18	130%
19 Kurigram Textile	9.41	8.38	80.73	65.48	146.21	548.72	1225.24	116.68	977.78	(247.46)		15.26	162%
Total	390.54	341.71	2259.57	926.89	3186.46	11550.96	39833.28	3136.28	38940.00	(1027.16			

Source: Ministry of Textiles

Table –7: Mill-Wise Exis Ting Working Capital & Loan of 19 Mill, Under BTMC as on 31st March, 1997

Particulars	Amin-1	Amin-2	Bengla-1	Bengla-2	Dost	Darwani	Dinajpur	Rajshahahi	Rangamati	Sundarban-1	Sundarban-2	Valika Woolen
A Current Assets:												
1 Inventories	206.91	276.36	121.23	234.13	175.54	571.52	271.85	149.32	102.42	803.45	130.81	530.25
2 Debtors	1.67	-	0.99	16.72	-	-	6.19	5.91	0.10	65.18	-	69.65
3 Advance, Deposits & Pre-payment	511.41	32.25	32.60	31.54	67.88	18.19	26.47	13.06	20.69	222.23	3.59	163.73
4 Inter-mil Account	252.50	5.40	57.45	297.35	-	24.07	17.06	46.16	19.67	1707.84	213.55	9.22
5 BTMC Current Account	-	-	-	-	-	318.20	59.25	68.01	-	207.47	-	141.11
6 Cash & Bank Balance	0.13	0.06	3.87	0.93	0.81	1.45	2.98	1.97	0.39	2.04	3.64	66.70
Total Current Assets	972.62	314.07	216.14	580.57	244.23	833.43	383.80	284.43	143.27	3008.21	351.59	980.66
B Current Liabilities:												
1 Cash Credit/Bank OD	229.97	153.80	126.22	181.70	123.79	132.34	86.32	150.80	80.41	268.11	-	1.73
2 Creditors for Expenses	25.06	34.90	596.52	965.63	13.46	94.27	659.97	181.74	144.69	80.75	155.07	47.47
3 Taxes & Duties	517.09	0.36	-	-	3.66	55.43	0.04	-	-	-	-	101.03
4 Inter-mill Account	8.04	650.36	117.84	73.71	16.44	5.08	16.28	33.91	4.09	265.23	1292.19	5.59
5 BTMC Current Account	339.22	478.49	625.31	2737.06	91.01	-	115.81	288.53	982.47	-	79.38	428.79
6 Loan from Govt.	-	-	-	-	73.01	90.89	183.04	195.67	103.36	93.99	30.89	29.09
7 Liabilities for Other Finance	38.77	54.42	37.65	49.87		90.89	183.04	195.67	103.36	93.99	30.89	29.09
8 Other Deferred Liabilities												
Total Current Liabilities	1158.15	1372.33	1503.54	4007.97	337.59	378.01	1061.46	979.58	1564.09	708.08	1557.53	613.70
Net Working Capital (A-B)	(185.53)	(1058.26)	(1287.40)	(3427.30)	(93.36)	555.42	(677.66)	(695.15)	(145.8)	2300.13	(1205.94)	366.96
C Long-term loan	134.16	2407.37	1381.52	306.26	931.20	98.41	418.94	811.26	495.30	-	-	58.95
Interest on CC@ 14%	32.1958	21.532	14.6708	25.438	17.3306	18.5276	12.0848	21.112	11.2574	37.5354	-	0.2422
Interest on L T Loan @ 10%	13.416	240.737	138.152	30.626	93.12	9.641	41.894	81.126	49.53	0	0	5.895
Total Interest	45.6118	262.269	155.8226	56.064	110.4506	26.1688	53.9788	102.238	60.7874	37.5354	0	6.1372

Cont. Table-7

	Ahmed Bawani	Chisty	Kokil	Orient	Quaderia	R. R Textile	Tangail	Sylhet	Magura	Kurigram	Grand Total
	325.62	230.43	206.84	86.15	106.67	218.29	205.14	190.61	161.58	106.79	5413.91
	93.38	13.97	0.33	0.30.	1.73	0.84	0.65	0.96	-	0.06	278.63
	119.58	76.58	37.26	6.30	169.14	192.79	70.73	22.70	34.97	37.07	1910.88
	70.97	8.15	21.52	9.85	124.50	16.47	7.29	10.55	90.89	9.00	3019.46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794.04
	38.33	0.55	18.23	18.82	5.48	4.95	17.69	0.81	2.69	0.12	192.64
	647.98	329.68	284.18	121.42	407.52	433.34	301.50	225.63	292.13	153.04	11,609.5
	163.15	98.90	137.34	33.18	61.34	187.60	103.67	84.01	64.20	80.24	2548.82
	332.73	469.17	38.14	27.22	94.99	55.86	82.97	310.76	258.58	38.70	4708.65
	27.71	46.90	-	5.53	169.36	179.00	84.17	-	-	0.24	1190.52
	146.45	13.25	12.65	7.23	17.13	13.88	15.26	6.43	11.85	13.87	2746.76
	1294.99	497.34	615.98	312.57	1287.70	495.57	1040.97	195.23	1228.10	359.05	13418.59
	1002.64	253.97	446.95	337.38	386.00	621.31	612.93	153.22	200.41	140.33	4524.04
	483.58	262.13	159.21	112.94	239.69	198.34	140.54	110.19	190.00	56.29	2242.91
	3451.25	1641.36	1410.27	836.05	2156.39	1751.36	2080.53	860.19	1953.14	697.72	32080.29
	(2803.27)	(1311.68)	(1126.09)	(714.63)	(1748.87)	(1318.02)	(1779.03)	(634.56)	(1661.01)	(544.68)	(20.470.75)
	1050.31	356.80	609.43	-	1535.92	991.57	1540.74	3458.20	3305.64	2880.81	22,77.79
	22.841	13.846	19.2276	46452	8.5876	26.264	14.5138	11.7614	8.988	11.2336	358.83
	105.031	35.68	60.943	0	153.592	99.157	154.074	345.82	330.564	288.081	2277.08
	127.872	49.526	80.1706	4.6452	162.1796	125.421	168.5878	357.5814	339.552	299.3146	2633.91

Table – 8 Working Capital Requirment for 19 Mills Under BTMC

Mills		Work-in-Process (1kg per spindle)		Finished Stock for one month	Raw materials for 4 months	Stores & Spares for 3 months	Others Overhead for one month	Total in lac taka	Existing net working capital	Net working capital require ment
		Spindles	Amount in lac Tk.	Amount in lac Tk.	Amount in lac Tk.	Amount in lac Tk.	Amount in lac Tk.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)
1	Amin Textile-1	16.076	11.42	111.14	277.02	6.99	38.57	445.13	(185.53)	630.66
	Amin Textile-2	23.500	16.24	203.03	500.43	8.20	136.09	863.99	(1058.26)	1622.25
2	Bengal Textile-1	16.085	13.23	144.10	354.04	5.00	58.01	574.38	(1287.40)	1861.78
	Bengal Textile-2	22.828	17.67	194.33	473.23	7.52	112.35	805.10	(3427.30)	4232.40
3	Dost Textile	18.200	14.17	166.67	422.63	14.08	76.68	694.43	(93.36)	787.79
4	Darwani Textile	22.500	16.13	171.32	449.14	9.02	87.73	733.34	555.42	177.92
5	Dinajpure Textile	22.500	16.59	155.32	391.29	8.74	72.60	644.52	(677.66)	1322.18
6	Rajshahi Textile	20.045	12.87	140.61	341.65	8.74	69.54	573.40	(695.15)	1268.55
7	Rangamatil Textile	17.280	14.18	146.61	355.68	6.99	59.97	583.43	(1420.82)	2004.25
8	Sundarban Textile	22.464	15.42	192.81	469.79	12.52	121.79	812.34	2300.13	(1487.79)
	Nilkamal -2	12.960	9.27	140.75	351.83	7.53	61.85	571.22	(125.94)	1777.16
9	Valika Woollen-Spg	1.310	3.34	25.54	73.01	1.58	0.47	103.74	366.96	(263.22)
	Vilika Woollen-Wvg	-	-	12.94	30.28	1.20	0.27	44.69		44.69
10	Ahmed Bawani-Spg	29.804	22.13	185.69	498.53	5.99	99.12	811.47	(2803.27)	3614.74
	Ahmed Bawani-Wvg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Chisty Textile	16.545	15.10	118.03	324.92	4.01	31.57	493.62	1311.68	1805.30
12	Kokil Textile	15.000	13.06	90.73	247.60	6.25	19.01	376.65	1126.09	1502.74
13	Orient Textile	11.216	10.63	104.56	298.21	5.76	22.10	441.26	714.63	1155.89
14	Quaderia Textile	16.824	13.45	146.82	344.46	7.98	62.54	575.25	1748.87	2324.12
15	R.R. Textile-Spg	28.260	23.09	209.76	577.14	17.06	105.58	932.64	1318.02	2250.66
	R.R. Textile-Wvg.	-	-	32.79	67.37	4.77	20.59	125.52	-	125.52
16	Tangail Cotton	23.802	17.40	156.77	396.26	9.76	73.79	653.98	1779.03	2433.01
17	Sylhet Textile	23.553	17.14	178.77	455.91	9.02	96.75	757.59	634.56	1392.15
18	Magura Textile	22.500	17.84	188.25	441.27	8.77	104.39	760.51	1661.01	2421.52
19	Kurigram Textile	11.029	7.91	102.10	200.42	3.77	35.43	349.64	544.68	894.32
	TOTAL	414.331	318.30	3319.44	8342.09	181.24	1566.78	13727.86	20470.75	34198.61

5. **Begotten Lessons:** From time immemorial we had a glorious heritage of producing high reputed Muslin, Jamdani and Silk fabrics. Dream of bring back that glorious past must move our mind sometimes or other. It is also true that our glory have had robbed away by some countries which are now on the column of most developed countries and voluntarily left producing textiles manufacturing – it being job of less developed and developing countries. But we are lagging behind those less developed and developing countries like China, Honkong, Shingapore, Korea, Indonesia and even the neighboring Srilanka, India and Pakistan. Within the overall macroeconomic framework, Bangladesh has the potential to develop textiles sector. The GATT Agreement of 1994 will also increase the market access of textiles and clothing exports from Bangladesh in 2005. But by that time restricted quata facilities under MFA, GSP, etc. will be phased out; other fabric producing countries will increase their own RMG exports; as a result Bangladesh will have to compete with those countries not only to take advantage of the increased foreign market access but also at home market.

On the basis of the threadbare discussion made in pages, the best possible solution for strengthening textile sector of Bangladesh is to privatize all the public sector mills and to establish new mills in private sector having balanced backward linkages and most modern technologies. But none of them could be done overnight. Even just closure of BTMC mills could create social problems for the government, since many people working there might be jobless. So the government might think it wise to run the mills to buy some time for an opportune privatization which would minimize the apprehended lobour problems. Public sector enterprises throughout the world could not give social benefits as was widely thought so during 1970s and early 1980s. It is also a fact that the World Bank Panacea did not fit well in most of the backward economies like Bangladesh. Rather indigenous peri-apts from local quack some times give good results. So we are to search out most appropriate herb form our neighborhood.

References :

Ahmad Salauddin: dyeing and Finishing Industry in Bangladesh, -do-

Ahmad, A.K. : The Textile Powerloom Sub-sector, The Textile Sector Study Project Implementation by Tarriff Commission, 1995.

Bangladesh Bureau of Statistics : Labour Force Survey, 1989.

Bhuiyan, A.R. : The Textile Spinning Sector, -do-

BTMC : Monthly MIS Reports for the years 1995, 1996 and 1997.

Chowdhury, A: The Traditional: Dyeing and Finishing Industry in Bangladesh, -do-

Export Promotion Bureau: Bangladesh Export Statistics; various volumes.

Government of Bangladesh : Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (P.O.27).

Govt. of Bangladesh : Industrial Investment Policy, 1973

Govt. of Bangladesh : Industrial Policy, 1986

Govt. of Bangladesh : Industrial Policy, 1991

Govt. of Bangladesh : New Industrial policy, 1982

Govt. of Bangladesh : New Investment Policy, 1979

Govt. of Bangladesh :Export Policy, Order, 1993-95

Govt. of Bangladesh: Investment Policy, 1974

Govt. of Bangladesh: Revised Investment Policy, 1975

ILO: General Report of the textile Committee Report No. 1, Geneva, 1991

Islam, Rashidan : Determinants of Wate Employment and Labour Supply in the labour surplus situation of Rural Bangladesh, BDS, Vol. 21No.2, June, 1993.

ITME: International production Cost Comparison : Spinning/ Weaving / Knitting, Zureich, 1993

Ministry of Textile : Quarterly MIS Report of TSMU Jan-December, 1995.

Ministry of Textile : Textile Policy, 1989

Ministry of Textile : Textile Policy, 1995

The World Bank: Bangladeh – From Stabilization to Growth, 1995.

UNO: Yearbook of International Trade Statistics, NY, various volumes.

World Bank: Labour Market Policies Higher Development, Report No. BD-13799,1995

Annex-1

Mills of which Capital was withdrawn

1 Abbasi Thread Ltd. (09-5-77)

2 Eastern Textile Mills (Nov. 78)

3 Zaritex Ltd. (Nov.78)

Disinvested Specialized Mills

1. Ahmed Silk Mills Ltd. (4-2-77)
2. Dhaka Dyeing and Mtg. Co. Ltd. (8-1-77)
3. Metex Cotton Mills Ltd. (3.10.77)
4. Jess Blanket Mtg. Co. Ltd. (19-5-77)
5. Alauddin and Taiwa Textile Mills Ltd. (Feb.77)

Mills assets of which were sold under liquidation

1. Mohini Mills Ltd. (5-2-82)
2. Dhakeswari Cotton Mills-1 & 2 (5-2-82)
3. Adarsha Cotton Spinning and Weaving Mills Ltd. (5-2-82)

Mills found without any Tangible properly

1. Paruma Textile Mills Ltd.
2. Elahi Cotton Mills Ltd.
3. Rupali Nylon Ltd.

Total = 14

30 Mills disinvested through transfer of assets/shares:

1. Al-Haj Textile Mills Ltd. (12-12-82)
2. Asiatic Cotton Mills Ltd. (5-12-82)
3. Bogra Cotton Spinning Co. Ltd. (14-12-82)
4. Chand Textile Mills Ltd. (8-12-82)
5. Chittagong Textile Mills Ltd. (6-12-82)
6. Gawsia Cotton Spinning Mills Ltd. (16-12-82)
7. Halima Textile Mills Ltd. (14-12-82)
8. Ibrahim Cotton Mills Ltd. (30-11-82)

9. Jalil Textile Mills Ltd. (15.12.82)
10. Moslin Cotton Mills Ltd. (12-12-82)
11. Ashraf Textile Mills Ltd. (30-11-82)
12. Afsar Cottton Mills Ltd.)6-3-83)
13. Calico Cotton Mills Ltd. (28-2-83)
14. Goalundo Textile Mills Ltd. (3-4-83)
15. Habibur Rahman Textile Mills Ltd. (9-3-83)
16. Jaba Textile Mills Ltd. (5-12-83)
17. Kushtia Textile Mills Ltd. (6-3-83)
18. Moula Textile Mills Ltd. (5-1-83)
19. Mainamati Textile Mills Ltd. (2-12-82)
20. Quashem Cotton Mills Ltd.)1-2-83)
21. Raz Textile Mills Ltd. (13-2-83)
22. Serajganj Spinning & Cotton Mills Ltd. (30-11-82)
23. Pahartali Textile Mills Ltd. (26-5-84)
24. Eagle Star Textile Mills Ltd. (1-6-85)
25. Mohammadi Calendering & Printing (27-2-83)
26. Cotton Textile Crafts Ltd. (14-2-83)
27. N. H. Textile Mills Ltd. (26-11-84)
28. Rupali Noor Textile Mill Ltd. (13-2-83)
29. Tamizuddin Textile Mills Ltd. (19-1-83)
30. Rahman Textile Mills Ltd. (28-2-87)

35. Mills under BTMC

1. Amin Textile Mills Ltd.'1 & 2
2. Bengal Textile Mills Ltd. 1 & 2
3. Dost Textile Mills Ltd.
4. Darwani Textile Mills Ltd.*
5. Dinajpur Textile Millsa Ltd.*
6. Rajshahi Textile Mills Ltd.*
7. Rangamati Textile Mills Ltd.*
8. Sunderban (& Nilkamal) Textile Mills Ltd.*

9. Vilika Woolln Mills Ltd. (spg. & Wvg.)
10. Ahmed Bawani Textile Mills Ltd. (spg. & Wvg.)
11. Chisty Textile Mills Ltd.
12. Kokil Textile Mills Ltd.
13. Orient Textile Mills Ltd.
14. Quaderia Textile Mills Ltd.
15. R.R. Textile Mills Ltd. (Spg. & Wvg.)
16. Tangail Textile Mills Ltd.
17. Sylhet Textile Mills Ltd.*
18. Magura Textile Mills Ltd.*
19. Kurigram Textile Mills Ltd. *
20. Chittaranjan Cotton Mills Ltd.
21. Luxmi Narayan Cotton Mills Ltd.
22. Pylon Industries Ltd.
23. Karilin Silk Mills Ltd.
24. Meghan Textile Mills Ltd.
25. Olympia Textile Mills Ltd.
26. Zeenat Textile Mills Ltd.
27. Satrang Textile Mill Ltd.
28. Monnoo Textile Mills Ltd.
29. Fine Cotton Textile Mills Ltd.
30. Engineering Industries Ltd.
31. Khulna Textile Mills Ltd.
32. Dhaka Cotton Mills Ltd.
33. Noakhali Textile Mills Ltd.
34. Bangladesh textile Mills Ltd.
35. National Cotton Mills Ltd.

* 12 Mills established by the BTMC

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 14. December 1999, Pouse. 1406

The Ozone Layer Depletion
International Response and Bangladesh

A. K. M. Nashirul Huq*

Abstract Global warming, air pollution and Ozone layer thinning are transforming the earth's climate and atmosphere. Of these, Ozone depletion is the one in which there has been the most significant progress in triggering international response. As it goes, Ozone limits the amount of harmful solar ultra-violet radiation that reach the earth. Without it, life on earth would be impossible. under normal conditions, chemical reactions triggered by sunlight destroy and replenish Ozone in the stratosphere, 15-50 Kms above the earth surface. But with the introduction of chemicals that contain chlorine, florine and bromine, the balance of nature with respect to the Ozone layer in the stratosphere has been upset; the earth's Ozone shield is being depleted by chemicals such as chloroflorocarbons(CFCs) which contain chlorine, florine and bromine (halons). These substances can survive in the atmosphere for more than a century, and each chlorine or halogen atom can gobble up tens of thousands of Ozone moleculs. Thinning of Ozone layer poses a great threat to life on earth as it allows dangerous UV radiation to pass through to the earth. The UV-B has potential harmful effects on human health, animals, plants, micro-organisms and air quality; long term exposure is associated with the risk of eye damage, suppression of the immune system and skin cancer. One percent decrease in Ozone layer may result in 3-6% increase in human skin cancer. Gradual unfolding of the atmospheric chemistry in relation to Ozone layer caused grave concern, and the UNEP took the lead in raising awareness about the danger amongst politicians, bureaucrats and members of the civil society. The UNEP pressed on for an international agreement and proded the governments of both developed and developing countries to sign a convention in 1985 in Vienna and later in 1987 a protocol in Montreal called "Montreal Protocol on Substances that deplete Ozone layer." The Protocol envisaged phasing out of the use of Ozone depleting substances (ODS) land the developing countries were allowed a grace period of 10 years for the purpose. The Protocol was ammended in London in 1990, in Copenhagen in 1992 and in Vienna in 1995. Bangladesh is a party to the protocol and as a developing country, enjoys a grace period of ten years and a schedule of ban for CFCs, halons and CCl_4 in 2010, methyl chloroform in 2015 and HCFCs in 2040. Bangladesh shares the concern and together with the international community, she has been implementing plans to promote the protection of Ozone layer.

"Nowhere, writes UNEP, is the interdependence of humanity more clearly demonstrated than in the intricate balance of the atmosphere around our planet. Riding the winds, or floating up to the stratosphere, pollution knows no frontiers. No country can fence off its patch of the skies. The ozone layer, the fragile

---

* Deputy Secratry, ERD

shield of gas which protects the earth from the harmful rays of the sun is a case in point. At the earth's surface, ozone is harmful, but its presence in the stratosphere, 15-50 kms. above our head is vital to life on earth."

What is Ozone layer ?

High up in the stratosphere, twice as high as Mount Everest or as Jet planes fly; is a gossamer veil with a crucial function. It is made of the gas called Ozone (O_3)- three Oxygen atoms (O) combined together as opposed to two oxygen atoms, stuck together, forming oxygen gas (O_2). In the Language of Chemistry, Ozone is another version of Oxygen, called allotrope of Oxygen. It is a poisonous, pale blue gas with pungent small. It is unstable so much so that it attacks and oxidies almost anything it contacts. Therefore, in the lower atmosphere, which is dense with materials with which it can react, including plant tissue and human lungs, Ozone is destructive and a short-lived air pollutant. in the stratosphere, however, there is not much for an ozone molecule to run into. Ozone is continuously created there by the action of sunlight (UV) on Oxygen molecule, and it lasts a relatively long time. Therefore, an "Ozone Layer" accumulates.

The Chemistry of Ozone formation

Although Ozone is present in the earth's atmosphere at all altitudes from the surface upto atleast 100 km. bulk of it is available in the stratospheric zone. Its concentration in the troposphere is low. However, in the troposphere it plays a vital role and effects the thermal radiation balance - warms up the earth's surface as a Green-house Gas.

The sunlight that falls on the upper atmosphere, stratosphere, contains much more ultra violet (UV) lights than those fall on

the surface of the earth. UV light has enough energy to bring about photochemical reactions that convert Oxygen (O_2) into Ozone (O_3). With the evolution of plant life on earth, the concentration of Oxygen increased in the atmosphere, and so the formation of Ozone from Oxygen, until an equilibrium was reached between the rate of formation of Ozone from Oxygen and the rate of decomposition of Ozone into Oxygen. $O_2 \Leftrightarrow O_3$. A Natural balance !

Ozone can absorb UV light. In doing so, Ozone protects Oxygen in the lower atmosphere (troposphere) from being dissociated and prevents most of the harmful rays from entering the earth's surface. The energy of the absorbed radiation heats up the Ozone creating warm layers high up in the stratosphere. The maximum concentration of Ozone, about 10 ppm, occurs 25-50 km from the earth's surface. The reactions may be shown as below:

(a) Oxygen (O_2) is dissociated by solar UV rays

$$O_2 \xrightarrow{\text{UV rays}} O + O \text{ (Oxygen atoms)}$$

(b) Some of the Oxygen atoms (O) formed combine with the Oxygen molecules (O_2) to form Ozone.

$$O + O_2 \longrightarrow O_3 \text{ (Ozone)}$$

(c) Ozone (O_3) absorbs UV light and dissociates:

$$O_3 \xrightarrow{\text{UV light}} O_2 + O$$

(d) Ozone (O_3) reacts with Oxygen atoms (O) to form Oxygen (O_2) molecule:

$$O_3 + O \text{ -----------}> 2O_2$$

The rates of formation and destruction of O_3 result in a steady state (equilibrium) concentration of Ozone (O_3) in the stratosphere. This is how nature balances itself. An attribute of nature.

The Ozone layer, thus formed, has a specific duty assigned by nature. In the stratosphere (upper atmosphere), it absorbs from the sun's incoming light most of a particularly harmful ultraviolet wavelength, UV-B. The light is like a stream of little bullets of energy with just the right frequency to break down organic molecules- the kinds of molecules that make up all life, including DNA molecules which are believed to carry the CODE for life's reproduction.

The UV Rays:

What are the ultra-violet rays ? How do they effect the life system on earth ? It is one of the components of the solar radiation - the sun rays-in the invisible region. Ultraviolet radiation is an electromagnetic radiation in the wavelength of approximately $4X10^{-7}$--- $5X10^{-9}$ metre --- between visible light waves and X-Rays

Wavelength

----------------------------------->

X- UV - VIBGYOR - IR--

Invisible visible

The longest ultraviolet radiation has wavelengths shorter than those of violet light - shortest perceptible by the eye. They

affect photographic film and plates; their action in the human body produces vitamin D. Most of the ultraviolet rays are absorbed by the Ozone layer and UV rays are classified as UV-A, UV-B and UB-C depending on wavelength or frequency. UV rays can be artificially produced by mercury-vapour lamp

Of the different types of UV rays, UV-B is the most harmful ray for humans. It is like energy bullet and when hits the living organisms, one possible result is cancer. UV-B light has long been known to cause skin cancer in fair-skinned people with considerable exposure to sun. Australia has the highest rate of skin cancer in the world; at current rates, two of every three will develop some kind of skin cancer during their lifetimes, and 1 in 60 will develop the most deadly type. Scientists estimate that for 1% decrease in the ozone layer, there will be an increase of 2% in the UV-B radiation at the earth's surface and an increase of 3-6% in the incidence of human skin cancer.

UV-B radiation can induce the growth of cancer as also suppress the immune system's ability to fight cancer. This suppression of the immune system also makes people more susceptible to other infections.

UV-B effects the eye. It can damage the retina and generate cataracts. It can burn the cornea and cause what is known as "snow blindness", occasionally very painful and repeated incidence can reduce vision permanently. Animals with eyes and skin are also expected to suffer like humans, when exposed to the sun. Briefly, other effects may be:

- Very small organisms are more likely to be damaged than large organisms because UV-B light can only penetrate a few layers of cells.

- UV-B light enters only the top few meters of the ocean, but this is the layer where most aquatic microorganisms live. These small plants and animals are particularly sensitive to UV-B radiation. They are also the base of most ocean food chains. An increase in UV-B could greatly perturb many populations of ocean life and destroy the food chain.

- UV-B light decreases leaf area, plant height and photosynthesis in green plants. Agricultural crop yields go down.

- Cultivated plants seen more sensitive to UV light than weeds.

It is to be borne in mind that nature induces many ways for the protection of living creatures form UV rays such as pigmentation, coverings of hairs or scales etc. and living creatures have varying degree of resistance or tolerance, so they respond differently.

The Ozone Hole: the signal of the disaster

1974 : Two scientific papers were published independently. Both suggested a continuing threat to the ozone layer. One predicted that chlorine atoms in the stratosphere could be powerful ozone destroyers. The other said that CFCs (Chlorofloro Carbon) were reaching the stratosphere and breaking up, releasing chlorine atoms. These papers predicted that human CFC use could trigger a hitherto unsuspected environmental disaster. October, 1984. Scientists of the British Antarctic Survey measured a 40% decrease in Ozone in the stratosphere. Their survey site was at Halley Bay in Antarctica. Their measurements showed Ozone declining steadily for about 10 years.

This was unbelievable. Scientists could not agree, and a 40% drop seemed impossible to them. The British Scientists rechecked their instruments. They looked for confirming measurements from other parts of the world, and finally they got one- 1600 kms to the north-west reported enormous decrease in the stratospheric Ozone.

May, 1985. An historic paper was published that announced on "Ozone hole" in the Southern Hemisphere. This was reverberating. Scientists at NASA, USA checked their instruments of Ozone measurement by Nimbus 7 satellite but found no ozone hole. Checking back, NASA scientists found that their computers had been programmed to reject very low Ozone readings. Recovering the rejects, they confirmed the Halley Bay readings and showed that Ozone readings had been droping over the south pole for over a decade. They provided a detailed map of the hole in Ozone layer. It was enormous, as big as the united States and as deep as the Mount Everest. It has been growing most years since 1979. Elsewhere, the Ozone layer is thinning. Over a wide belt of the Northern Hemisphere, average concentration of Ozone has decreased by 1% in summer and 4% in the winter in the last 20 years.

Why the hole ? Why over Antarctica ?

Questions that puzzle us are: why a hole ? Why over Antarctica ? Why not elsewhere ? The work of the scientists over the next few years to solve this mystery was extra-ordinary. The most stunning evidence that chlorine was indeed the culprit causing the Ozone hole was gathered in September, 1987 when scientists flew an airplane from south America directly toward the South Pole and into the Ozone hole.

Rises and drops in Ozone are almost exactly mirrored by drops and rises in ClO. Furthermore, the measured ClO concentrations in the "Hole" are hundreds of times higher than any level that could be explained by normal atmospheric chemistry. This is often referred to as the "smoking gun", even the CFC manufactures thought that the Ozone hole was not a normal phenomenon. It is a sign of a highly perturbed atmosphere, caused by human induced actions using chlorine containing pollutants.

It took several years for scientists to come up with an explanation for the hole. Here it is:

Antarctica is surrounded by oceans, so winds circle around the continent uninterrupted by land mass. In the southern winter, they create a "circumpolar vortex"- a whirl of winds that traps air over Antarctica and keeps it aloof from mixing with the rest of the atmosphere. The vortex then sets up a "reaction vessel" of polar atmospheric chemicals. By contrast, there is not such a strong vortex around the North Pole, so the northern Ozone hole is less pronounced.

In winter, the Antarctic stratosphere is the coldest place on earth (down to - 90^0c). In that extreme cold, water vapour hovers as a fog of minute ice crystals high up where the Ozone layer is. The surfaces of these innumerable tiny crystals enhance the chemical reactions that release chlorine which destroys Ozone.

The chlorine atoms formed in the dark of the winter of the Antarctica do not immediately enter the chain reaction of Ozone destruction. Instead, they react just once with Ozone to form ClO. The ClO molecules come together to form a relatively stable ClO-ClO, a dimer. An accumulation of the ClO-OCl dimer builds up, poised and waiting for the return of the sun.

In the spring, when the light returns in the Antarctica, solar radiation breaks up the CIO-OCI dimer to release an enormous burst of chlorine (CI) which goes to work on the Ozone. Ozone concentration drops propitiously within a few weeks which is why the hole is observed only in the spring. At some altitudes, more than 97% of the Ozone vanishes.

The returning sunlight gradually dissipates the "circumpolar vortex, allowing south polar air to mix again. Ozone depleted air is dispersed over the rest of the globe, as Ozone levels over Antarctica return nearly to normal.

Lesser hole has been observed over the North Pole in the northern spring. Discrete holes are not expected to be found elsewhere. But as the Ozone-destroying gasses in the atmosphere mix, the concentration of ozone in the stratosphere above the whole earth is decreasing measurably. Because of the long delays in CFCs reaching the stratosphere, more Ozone depletion is inevetible. Because of long lifetimes of CFCs and chlorine in the atmosphere, the depletion will last for at least a century, even if all CFC release stop immediately.

Ozone layer destruction : How ?

The question is: How is Ozone layer in the upper atmosphere depleted ? What causes this depletion ? We have so far learnt that chlorine in the upper atmosphere (stratosphere) is responsible for the thinning of the Ozone layer, and this chlorine originates from human use of an organic compound, called CFC (chloroflorocarbon). CFCs used in aerosol, electronic and other industrials, when released in the atmosphere, gradually rises to the stratosphere, and are broken down by the UV-B rays in the stratosphere, to release free chlorine atoms. Chlorine, so released, reacts with the

stratospheric Ozone to make Oxygen and chlorine oxide (CIO). Then the chlorine oxide (CIO) reacts with an oxygen atom (O) to make oxygen gas (O_2) and chlorine (CI) again. The chlorine atom can then turn another Ozone (O_3) molecule into oxygen and be regenerated yet again.

The reactions may be shown simply as follows:

$$CFCI_3 \xrightarrow{UV - B} CI + fragment$$

$$CI + O_3 \longrightarrow CIO + O_2$$

$$CIO + O \longrightarrow CI + O_2$$

It is obvious that a chain reaction occurs. One notorious chlorine atom can cycle through this series of reactions over and over, destroying one Ozone molecule each time and gobbling Ozone molecule one after another and then being regenerated to gobble again. The average CI atom can destroy about 100,000 Ozone molecules before it is finally removed from the atmosphere. For the removal, CI reacts with methane to produce Hydrochloric acid ($CH_4 + CI_2 = CH3CI + HCI$). At that point, two things can happen: either the HCI can break up, release CI again, and continue the cycle of Ozone destruction or the HCI can sink down into the lower atmosphere, where it typically dissolves in water and comes back to the earth as acid rain.

Regeneration of CI is only one insidious characteristic of the Ozone destruction process. Another is the time-leg between the human synthesis of a CFC molecule and its arrival in the stratosphere. For some uses (such as aerosol propellants), CFC is quickly discharged into the air. For other uses (such as refrigerators and foam insulation), the CFC may be released

Table-I : Uses, Production Rates, and Residence Times of the Important Ozone-Deploementing Chemicals

Compound	Chemical formula	Ozone depletion potential	Uses	1985 world production (tons)	Residence time in atmosphere (Year)
CFC-001	$CFCl_3$	1.0	Refrigeration, aerosol, foam	298,000	65-75
CFC-012	CF_2Cl_2	0.9-1.0	Refrigeration, aerosol, foam, sterilization, food, freezing, heat, detectors, warning devices, cosmetics, pressurized blowers	438,000	100-140
CFC-113	CCl_3CF_3	0.8-0.9	Solvent cosmetics	138,500	100-134
CFC-114	$CClr_2CClF_4$	0.7-1.0	Refrigeration	300	
CCF-115	$CClF_2CF_3$	0.4-0.6	Refrigeration, Whipped topping stabilizer		500
Halon-1301	$CBrF_3$	10.0-13.2	Fire fighting	2,600	110
HCFC-22	$CHClF_2$	0.05	Refrigeration, aerosol, foam fire fighting	81,200	16-20
Methyl					
Chloroform	CH_3CCl_3	0.15	Solvent	499-500	5.0-10
Carbon	CCl_4				
Tetrachloride	CCl_4	1.2	Solvent	71,200	50-69

years or even decades after production. After release, it takes about fifteen years for a CFC molecule released on the earth's surface to work its way upto the high stratosphere where it breaks down, releases chlorine (Cl), which reacts with Ozone. So the thinning of Ozone layer measured at any time is a result of CFCs manufactured and released fifteen or more years ago.

What are CFCs ?

The CFCs are organic chemical compounds. The CFCs stand for chloroflurocarbons - C for chlorine, F for Flurine and the C for Carbon. These are some of the most useful compounds ever invented by human beings. The list of the compounds is shown at **Table I.** They are non-toxic and stable. They do not burn or react with other substances or corrode materials. Because of their low thermal conductivity, they make excellent insulators when blown into plastic foam for hot-drink cups, hamburger containers or wall insulation. Some CFCs evaporate and these properties make them perfect coolants for refrigerators under trade name Freon. They also make good solvents for clearing metals, electronic circuit boards and airplane parts.

Originally developed in 1920s for use as refrigerant fluids these compounds were called 'MIRACLE' compounds because of their so many uses, easiness to use and low cost. They are inflammable and insoluble in water. Because of their lack of reactivity and insolubility in water, there is no natural and easy process of removing CFCs. In fact they drift up high into the stratosphere where they are consumed in the most undesirable reaction leading to Ozone layer depletion. Structurally, CFCs may be considered derivatives of methane (CH_4), a major component of natural gas. Let us see how it looks like:

CH_4

Methane

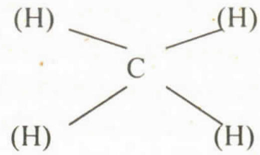

When the hydrogen atoms of methane are replaced by chlorine and Flourine atoms, we get chlorofluoro carbons. Examples:

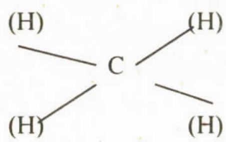

Methane (CH_4)

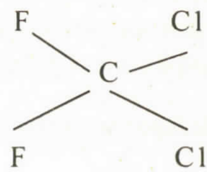

(dichloro fluoro methane)

CFC-12

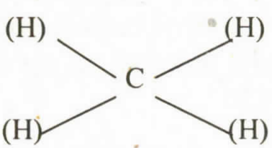

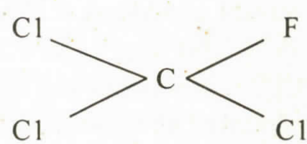

(trichloro Fluoro methane)

CFC-11

CFCs contribute to the Greenhouse effect which warms the earth. CFCs are 10,000 times more effective than carbon dioxide in absorbing infra-red radiation i.e. 10,000 times stronger than CO_2 in terms of warming potential.

As the table shows, from 1950 to 1975, world production of CFCs grew at 7% to 10% per-year - doubling every 10 years or less. By the 1980s, the world was manufacturing a million tones of CFCs annually. In the United States alone, CFC coolants were at work in 100 million refrigerators, 30 million freezers, 45 million home air conditions, 90 million car air conditioners and hundreds of thousands of coolers in other places. The average North American or European was using 2 pounds (0.85 Kg) of CFC per year. The average Chinese or Indian was using less than an ounce (0.03 Kg). For large number of chemical companies, the CFCs were a major source of income.

The Response to the Threat

The first response was launched by a body of American environmentalist who went into action by first condemning the aerosol spray cans. Consumers responded. Sales of aerosols plummeted by over 60%. Political pressure mounted for a law to ban CFC containing aerosol. A law forbidding the use of aerosol containing CFCs was passed in the United States in 1978. This resulted in a 25% drop in worldwide manufacture of CFCs. In most of the rest of the word, however, its use still continued along with other uses of CFCS.

Since UNEP's ear!iest days, Ozone layer had been high among its concern. UNEP was mounting its rescue operation even before all the evidence was in. In 1977 UNEP convened an experts' group meeting which adopted a World Plan of Action on the Ozone Layer and it published its first assessment of the problem in 1978. As the atmospheric scientists gradually unfodded the complicated chemistry of the Ozone layer. UNEP pressed on, hosted and prodded international political process. In 1981 it set up a working group to develop a global convention for the protection of the ozone layer. The idea was to get down to the difficult task of agreeing on how to control the chemicals which are harming it.

The convention was signed in Vienna in March 1985 by 20 countries and the EC. The signatories made no commitment to control measures or to limit the use of CFCs. In spite of this, the convention was a landmark. Five years later, the convention had 66 parties including the EC. It contained pledges to cooperate in research and monitoring and share information on CFC production and emission etc.

The Montreal Protocol

The story of the Ozone hole, published in May 1985, added urgency to the task of agreeing a protocol to control emissions of CFCs and other Ozone destroying substances. So did the fact that CFCs and halons also contribute to the greenhouse effect which will probably change the earth's climate in the next century.

The negotiating process was not easy. The nations had never before confronted a global environmental problem before it was completely understood. Major CFC producing nations played predictable role in trying to block any strong cutback in CFC use. Critical decisions hung on delicate political threads. The USA, for example, played a strong leadership role which was sometimes undercut by deep divisions within Regan administration.

UNEP pressed on. Its director, Mostafa K. Tolba proved a skilled environmental diplomat, remaining neutral in many squabbles that arose, and reminding everyone that short-term or selfish consideration would jeopardise existence of life on earth. Environmental groups in Europe and the USA put heat on their governments. Scientists conducted workshop to educate journalists, parliamentarians, and the public.

The negotiations in 1986 and 1987 were tough, with some countries arguing for an almost total phase-out of CFCs and halons, and others maintaining that a freeze on production would be adequate. Developing countries which only consumed some 10% of the worlds' CFCs, were naturally anxious that countries should not stop them developing such technologies as refrigeration.

In spite of these difficulties, national governments finally - and surprisingly quickly - signed in Montreal in September 1987 a Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Known as the Montreal Protocol, it stipulated first that world production of the first five most commonly used CFCs should be frozen at 1986 levels. Then production should be reduced by 20% by 1993, and finally by another 30% by 1998. This "freeze-2030" agreement was signed by 46 nations including all the major producers of CFCs. The protocol came into force on 1 January, 1989. Meanwhile, in May 1989, 81 countries agreed in Helsinki to phase out CFCs and halons altogether and to restrict emissions of other substances.

In June 1989, the Parties to the Montreal Protocol met in London and agreed to phase out CFCs, halons and carbon tetrachloride by 2000 and Methyl Chloroform by 2005. The conference marked a breakthrough in environmental diplomacy. For special needs of the developing countries, Montreal Protocol, however, allows the developing countries with per capita consumption of less than 0.3 Kg., a 10 years grace period for the control measure. The protocol was further amended in Copenhagen in 1992 and Vienna in 1995. In these amendments,

the phase-out programmes were further advanced. Bangladesh is among the Parties to the Protocol.

The Multilateral Fund

During the amendment of the Montreal Protocol in London in 1990, several third world countries refused to sign unless an international fund was established to help them with the technical shift to CFC alternatives. When the United States balked at contributing to that fund, the agreement almost failed, but in the end the fund was established. Industrialised countries contribute to the Fund according to the standard UN scale of assessment.

The Multilateral Fund has its secretarial in Montreal and is directed by its Executive Committee comprising of representatives of seven developed and seven developing countries selected by the annual meeting of the Parties to the Protocol. The Fund now operates through UNEP, UNDP, UNIDO and the World Bank. From this Fund, grants and concessional disbursements are made to developing countries, provided the Parties agree to the specific expenditures. This agreement on financing arrangements paved the way for the support of major third world countries such as China, India and Brazil. Bangladesh received a great of US $ 150,000 for strengthening institutional capacity implemented by Department of Environment. For the ACI Project which aims at phasing out use of Ozone depleting substance, Bangladesh got a small chunk of US $ 322,000/ from the Multilateral Fund.

Bangladesh in Ozone layer Protection

Bangladesh joins the international response process against Ozone layer thinning and the promotion of its protection.

Sharing the global concern, Bangladesh accessed to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer on 02 August, 1990 and ratified the London amendment on 18 March, 1994. In terms of the provisions of the protocol, control measures are to be pout in place with regard to import and consumption of ODS (Ozone depleting Substances) in Bangladesh from July, 1999. The relaxation for the developing countries will also apply to Bangladesh. It will enjoy a 10- year grace period and a schedule of ban for CFCs, halons and carbon tetrachloride in 2010, Methyl Chloroform in 2015 and for HCFCs in 2040.

As a signatory to the Montreal protocol, Bangladesh is committed to gradually phasing out use of ODS. According to a survey of 1995, the ODS used in Bangladesh was as follows:

Substance	Quantity (M.T)	% of total ODS in aerosol/ refrigeration/industry
CFC-11	88,610	27.00
CFC-12	192,070	58.50
HCFC-22	37,810	11.52
Methyl Chloroform	2.231	0.68
Others	0.060	0.06

Bangladesh is also using alternative substances and technologies in firefighting, aerosols, refrigeration and foam. Government approved ACI project will phase out 50% use of CFC-11 and CFC-12. Contemplation of recycling will reduce demand for new production. To contain unnecessary emission of CFCs, a comprehensive national program for recovery and recycling of refrigerants is under consideration.

Raising awareness among the stakeholders is high on the agenda of the Government. The Department of Environment has

been implementing various projects and has established an "Ozone Cell" in the department. In keeping with the declarations of the UNEP, Bangladesh observes 'Ozone' day on 16 September'99.

NGOs are also active in raising awareness of the people. The people can also help supplement Governments' efforts by using CFC free refrigerators, LPG based aerosol products and using substitutes for other products. Care should also be given to repair leakage of air conditioners/refrigerator to reduce risk of release of CFCs in the atmosphere. The sense of wisdom thus displayed by the world community with so much of concern and celerity to protect the earth from the environment disaster was unique in the recent history. The line of divide between the developing and the developed nations sunk for a common cause - the shared concern for existence on earth.

Reperences :

Benedick, R. E (1991); Ozone Diplomacy; New directions in safe guarding the Planet; USA: Harvard University Press.

Meadows, D. H and Meadows D.L (1992), Beyond the Limits, USA :Green Publishing Co., Vermont.

Miller, A. L M (1995), the Third World in Global Environmental Politics; Buckingham : University press

Ramsden, E. N 1994, A-level Chemistry, London: Stanley Thrones Publishers Ltd.

UNEP Profile, Nairobi, July 1990

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 14, December 1999, Pouse, 1406

Poverty and Housing Linkages *A Case Study of Pavement Dwellers in Dhaka Mega-* City

Syed Shamsul Alam*

Abstract : There are many programmes both under Government and Non-Government initiatives working for the development of slums and squatter settlers of the different cities and urban areas in Bangladesh. For example the successful Slum Improvement programme (SIP) has been in operation since 1985. While no single such programme in any urban areas or even in Dhaka City has so far been taken for the improvement of pavement dwellers. This case study is presumably the survey first of its kind, where an attempt has been made to highlight the sosci-economic condition and to analyse the determining factors which influence the status of pavement dwellers in the Dhaka Mega-City. It also offers some recommendations and policy options on the basis of the feedback given by the 367 respondents for the Government as well as NGO's for taking appropriate plan and programme for them in future.

Introduction

Historically, poverty has been mainly concentrated in the rural areas throughout the world, while prosperity prevailed in the cities of both Western Europe and Third world countries. In fact " Cities, in the past were like the makers of wealth, magnets for the industrious and motors for invention, but their massive power to contribute to economic development and create opportunity to delivers their goods and services were unequal"[1]. Over the years scale of urbanization has exceeded than any other time in the history, while urban infrastructures have not expanded commensurate with population growth. This has widened the gap between those associated with economic growth or affluence and those associated with poverty.

The concept of shelter regarding the urban poor in the developing countries can be classified into three major dimensions. In the first category any type of residence is a vital factor of production in their economic pursuits: while in the

* Director, BPATC.

second it is merely a barricade for privacy in a highly congested urban environment. Third category is urban poor who live and earn their living with no form of shelter whatsoever[2]. This class of people who not have municipal addresses, but live in various open spaces such as pavements, open verandahs, under bridges, railway platforms, abandoned large pipes, courtyards of religious places and even on hand- carts that they pull in the daytime to earn their living is the target group of this study. The section of the urban poor who live in squatters and slums has been kept outside of the purview of this study, as our focus of attention is the truly shelterless people.

Objective of the study

The present survey is a case- study on the pavement dwellers of Dhaka Mega-city to analyse the major causes of being pavement dwellers and highlight their socio-economic conditions.

More specifically the objectives of the present study are (a) to ascertain the reasons of living on the pavements through enumeration based on spot visits, and (b) to collect socio-economic information as well as their life- styles. It is worth mentioning here that since the class of population under study includes the floating population, the selection of the season and the hour of enumeration become critical for accuracy of the study.

In order to achieve these objectives, this paper has been divided into four sections. The first section describes the sources of data and survey methodology for this study and presents a picture of the size, nature and magnitude of the problem. The second section analyses the economic characteristics of the pavement dwellers, which as a class can be considered as the poorest of the urban poor. The third section examines the income-shelter

linkages, and the fourth section attempts to derive some recommendations and conclusion.

Methodology & Sources of Data.

This paper is based primarily on the data derived from the field survey conducted by the author to find out the major reasons of the socio- economic condition of a section of urban poor , who have for various reasons chosen pavements of Dhaka city as their place of residence. It was also intended to make an on - the-spot count of the floating population within the 360sq. km. geographical limit of Dhaka city Corporation area, in which it is estimated there are approximately, 1,104,600 million slum squatter and pavement dwellers[3].

The survey was carried out for ten consecutive days between March 6 and March 15, 1998at night 10 PM to 3 A.M..About 10 assistants were engaged for the collection of data during the survey. For both operational convenience and collection of data the total area of Dhaka City Corporation was divided into five survey blocks of different sizes. A survey schedule was designed to identify the locations on the pavements of thorough-fares where the people were sleeping, and counted physically. Each survey block took one night's intense work, and a head-count of pavement dweller population in the city.

Among the identified blocks initially the samples were drawn and subsequently the survey personnel were sent with detailed questionnaires. They were advised to select sample persons at random at the designated locations. The survey questionnaire was divided into major two sections, incorporating the information on occupational and income features, migratory trends and a poverty profile.

Findings of the Survey.

(a) Causes of Pavement dwellers

The total number of pavement dwellers covered in the study were 367 located within the Dhaka City Corporation. These sample respondents along with their dependents were 1207, which represent about 30 percent of the total pavement dwellers. More than 90% of the respondents mentioned that lack of getting expected earning opportunity as well as lack of getting living facilities from any close relatives and friends thrown them to be pavement dwellers immediately after the arrival of Dhaka City. About 78 percent of respondents mentioned that they are still desperately searching any place to live in, but their earning do not permit them to find residence even with share basis. Only 15percent of the them preferred live in the pavement, as they believe their earning at present and in future would not enable them to spend for accommodation. Generalisation of above opinions clearly indicates that the amount of income per day or month has compelled them to he a pavement dwellers.

About 50 percent of the total respondents preferred to live in the pavements of Central Business District (CBD) of Dhaka cop city Corporation because of proximity working place and other 50 percent chosen commercial areas of Dhaka city such as the wholesale markets, bus terminal, launch ghat and railway stations which offer best opportunities to earn a livelihood of selling labour services in highly competitive environments. Almost all pavement dwellers purchase their meals, from the footpath shop, which is commonly known as Italian Hotels .

More then 60 percent of pavement dwellers live without shelter as a deliberate rational decision, but the uncertain income has made them desperate to take this option. However, living on the

pavements ensures access to earning opportunities, however small they may be .

b) Poverty Profile.

In the present section an attempt was made to examine poverty-profile linkage, with reference to occupation, income distribution, willingness and ability to pay for shelter. The pavement dwellers covered in the sample study were found to be engaged in over thirty different occupations with significant intra-occupational income differentials. Table 1 describes the ***principal*** category among the pavement dwellers. Information in Table I has been for analytical convenience, divided into two major categories. First major category is termed as the ***principal*** informal sector with average daily income ranging between Tk.80 and Tk.120. While other group is termed as ***marginal*** category for being almost wholly in the tertiary sector. A distinction between the sub-groups has been made on the basis of their occupation and variations of income.

(c) Principal Occupations

The principal occupations consist about 80 percent of employment, amongst which about half the numbers are rickshaw pullers and daily casual labours who secure employment in the commercial areas and are engaged in trans-shipping materials and equipment over short distances. The other half is almost equally divided between handcart pullers hawkers, potters and helpers. The former group rent the rickshaws from owners on contact to carry passengers within the city, while the latter cater to the needs of casual labours for the residents of the city.

Table- 1: Distribution of Major Occupation

A	Principal Category	Percent (%)
1.	Rickshaw Pullers	18
2	Daily casual labour	17
3	Hard cart-pullers	15
4	Hawkers	12
5	Potters/Helpers	10
6	Shop Assistants	07
	Sub-total	79
B	**Marginal category**	-
1	Beggars	06
2	Tokais	05
3	Domestic Servants	03
4	Others	07
	Sub-total	21
	Grand total	100

In the principal category as many as six major classes have been identified in the Table-1. Respondents have mentioned several reasons which compel them to stay in the CBD area for example, the hand cart pullers and rickshaw pullers need to have a parking spot for their vehicles and in the congested slums of the city such space is usually unavailable. Moreover, one has to guard against possible theft of equipment. Secondly, in the case of porters, employment is secured in commercial establishments where employer entrusts these persons for knowing each other. Moreover spending the night near the source of employment ensures that the person is available on first call, and in addition, potential rivals are excluded from the earning opportunity. Third, all these activities provide scope for earning insignificant amount of money and as well as require

physical exertion. Under conditions of intense poverty people are naturally reluctant to expense extra energy on unnecessary lead-time commuting between the residence and work place.

The second major of principal category consists of self-employed persons, who have been again divided into two classes for example, service related and other occupations. Service related are vocations providing employment for at least 17 percent of the sample population. They are teashop keepers, vegetable vendors, hawkers and sweepers. Other occupations cover a diverse range of service and production activities ranging from paper bag makers to painters, from cobblers to tokaies. Among the self-employed persons earning opportunities are location-specific. A shoeshine boy for example works on a busy thoroughfare by seating a strategic point in the appropriate location for his business. In all such vocations the place of work becomes the place of shelter of the respective persons. Moreover, in many trading activities the individual has to safeguard his inventories against theft.

The third group comprises of daily labour engaged in a miscellaneous range of activities such as shop assistants, helpers to skilled construction workers and labour that is supplied to the city's daily labour markets. A distinction between shop assistants and daily casual labour has been made because the former work is of a durable in nature with long-term relations with employers. But the day labourers do not have this guarantees he has to make available appropriate place in order to seek best possible opportunity to get the work. This could be for one day or sometimes for weeks. The interesting point emerging from this study is that wages between the occupations

do not show marked differentials. However within specific occupations substantial income variations were observed.

(d) **Marginal Occupation**

The marginal category divided into four groups(See Table-1) composed of mainly domestic servants, beggars and tokais. Data also indicates, there is a sharp dichotomy in earning levels between the principal and marginal groups. In the marginal sector, incomes are extremely low, and working hours extend to all seven days of the work. Ragpicking is the only activity earning an hourly (imputed) wage of more than one taka, and this is clearly a most undesirable and the sanitary type of vocation. Earning of this category of people differ greatly from man to man, but less than the man of principal category. About 7 percent of this category sometime had to spend the night without meal, as they were not able earn the minimum amount of money. The implications for shelter-income linkages will obviously be significantly different between the principal and the marginal vocations. In overall terms, the pavement dwellers have had their income levels keeping pace with inflation. About 19 percent of pavement dwellers reported income levels less than Tk. 30 per week than previous year. In the present study the average income itself was around Tk.95 per day.

In this category, except very few, large number of beggars earning were far less than the member of principal category. Their belonging are most cases, very insignificant they can easily spent their night any where as they wish. But in case of domestic servnts and Tokais they prefer to stay on their place of work. While for other categories some of them prefer stay on specific areas as an opportunity of getting the type of work they are doing and for other do not have this choice. They are more concern about the work rather than place of staying.

(e) **Working Hours**

In most of the cases the average working day is a fairly uniform eight hours for six days a week. There are however several individuals (particularly among porters, hawkers and shop assistants), who work several hours in excess of the average. The longest working day was found to observe amongst the sedentary occupations, such as tea shopkeepers, fruit and vegetable vendors, etc. The beggars and daily casual labourers follow as such specific working hours, it usually starts as long as the movement of people continues from dawn to even after sunsets.

(f) **Families and Meals**

About 29 percent of the sample lived on pavement with families, a majority of whom belonged to the marginal sector. Out of sixty one respondents who reported having only one meal a day, cooked food in open kitchens. In the mainstream categories respondents do not have any such arrangement. All of them have their meals from the pavement hotels commonly known as "Italian hotels"

(g) **Poverty - Housing Linkages**

For the findings on the pavement dwellers about the willingness to pay for shelter, each respondent was asked how much he or she was willing to pay per night for a shelter. It is important to note that the gap in willingness to pay between the mainstream and marginal categories is fairly narrow.

Another feature that confirms poor income-shelter linkages is the available information on respondents length of stay on pavements. Out of 568 respondents in the sample study, 42 persons claimed Dhaka's pavements to be their place of birth itself. The remaining persons reported that they came mainly from the villages of Faridpur, Barisal, Noakhali, Comilla, and

other districts. Most common features found in more than 80 percent respondents, that they have had inherent quality of getting housing fairly but the poverty itself is the main culprit depriving them.

For the recently migrants people as a group, an attempt was made to test the hypothesis whether willingness to pay for shelter would be negatively or positively related to income and duration of stay in the city. The results of their opinion were statistically significant. The point of interest is that willingness to pay for shelter is uniformly high for all categories of pavement dwellers. While migrants remit substantial savings home and non-migrants spend money on tobacco, liquor and cinema other entertainments.

The above results indicate a positive willingness to pay for shelter when (i) duration of stay on the pavement is longer (i.e. older the person gets), and (ii) individual income earnings is considerably higher. What is more intriguing however, is the positive relationship between family size and willingness to pay for shelter. On further analysis, why family size shows positively related to willingness to pay for shelter, the following findings emerged: (a) among Dhaka born pavement dwellers, respondents with spouses and dependants desperately needed for a shelter not only for sake of shelter but also for the social recognition and future for the generation. Thus living on the pavement may be a means of access to earning opportunities for an individual as well as for family members; nevertheless, no one does like to be pavement dwellers in his life.

Recommendations

Considering the opinions of the pavement dwellers, considering the trend of migration of this type of people in Dhaka Maga City and also considering the findings of other studies, it is evident that no initiative has taken so far both by the

Government as well as by the NGO's for the improvement of pavement dwellers in Dhaka Mega City. Given this situation, several actions need to be taken right-away:-

(a) Soft long-term loan can be given to the pavement dwellers to run small business. This would not only enable them to earn certain amount of money but help them to find out a shelter.

(b) One pertinent issue can be consider by the policy makers to construct inexpensive dormitory-type housing for pavement dwellers. The difficulty here lies in execution, not only for the budgetary constraints but also appropriate areas where pavement dwellers would like these structures to be constructed. The residents on the CBD and commercial areas pavements. Costs of acquisition of land in these areas are expensive and very stringent in nature. But the Government with foreign assistance would make a comprehensive plan as in case of slum dwellers residential facility.

(c) NGO can also take special initiative to provide funding for the pavement dwellers, appropriate type of earning opportunity on the basis of their age and physical conditions, so that their earning would make them able to spent on housing.

Conclusion:

The main lessons that emerge from the interpretation of poverty-shelter linkages that the amount of earning made the pavement dwellers unable them to afford even the low cost housing. Poverty pushes them to the city with a hope of getting employment opportunity. But the Dhaka City does not have the capacity to provide expected employment opportunity of the in-migrants as well as unable to absorb the enormous influx of

these workers. Subsequently they forced to take ill-paying or hazardous jobs, which do not generate enough income to meet their basic needs for food and shelter. This situation not only compels them to accept the reality but also forces them to take shelter on the roads. Unless an integrated approach and concerted efforts are taken to resolve this issue without further delay, the city of Dhaka would turn into a city of pavement dwellers. This would aggravate existing law and order situation, environmental condition, and inequalities of income as well as restrict to the basic public services to the urban residents.

References :

Asian Development Bank, *Urban Poverty Reduction Project* (IDSS, Bangladesh Consultant Ltd. & Proshika 1996).

Centre for Urban Studies, *Slums and Squatters in Dhaka City*, University of Dhaka, 1988.

Mc Callum ,Douglas and S. Benjamin; *Low-income Urban* Asian Development Bank, *Urban Poverty Reduction Project* (IDSS, Bangladesh Consultant Ltd. *Housing in the Third world: Broadening the Economic perspective*, Urban Studies (1985).

Planning commission, *Task Force on Social Implication of Urbanization*, Government of Bangladesh, Dhaka, 1991).

The United Nations Environment Programme, *World Resources: A Guide to the Global Environment. The Urban Environment* (The world Bank, Washington D.C.1996)

The World Bank, *Livable Cities for the 21st Century* (The World Bank, Washington, D.C, 1996).

United Nations Children's Fund, *Evaluation Study of Slum Improvement Project*, (Sodev Consultant, Dhaka, 1994).

UPM formal Paper. Toward Environmental Strategies for Cities: Policy Considerations for Urban Environmental Management in Developing Countries.

•LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 14, December 1999, Pouse, 1406

Purchase, Sales and Store Management

Md. Shah Alam Ghazi*

Abstract : There is a general consensus among all financial managers of any kind of organization that without appropriate proper goods and services, the organization can not run smoothly. To meet the above objective, it is important to know the methods of purchase, sales and store management of any offices/ organizations. Keeping in mind this view, an attempt has been made to understand the methods and procedures of purchase, sales and store management in this article. This article may help to broaden the knowledge of the participants of Foundation Training Course as well as the participants of different short training courses like- office Management course, Financial Management course etc. who are directly involve in purchasing, sales and store management of offices/organization so that they can manage their business effectively.

Purchase Management

Purchase is an important management process of any organization both for the public and the private sector. To buy materials of the standard quality, of sufficient quantity, at the right time, with appropriate price from the right source are called the active management process. All kinds of government organizations should purchase different kinds of goods and services. Each government officer Must have a duty and responsibility to purchase such kinds of goods with efficiency. The concerned officer must proceed following Government Financial Rules, Orders and existing circulars. Therefore, purchase is one of the important management processes of an organization.

* Assistant Director, BPATC.

Stages of procurement

There are ten stages of procurement such as:-

a) to identify demand according to the nature of programme/ needs;
b) to submit indent for procurement ;
c) to take decisions for purchase ;
d) to invite tenders/ bids ;
e) to receive the tender documents and process it ;
f) to sign the contract form and issue the work order ;
g) to ensure quality of goods from suppliers ;
h) to receive the goods and enter it into the stock register ;
i) to receive bidders document/ bills for payment ;
j) to examine the bills and make necessary arrangements for payments ;

Principles of procurement

Under section 145 of the General Financial Rules purchase must be made in the most economical manner in accordance with the definite requirements of the public service. Stores should not be purchased in small quantities. Periodical indents should be prepared and as many articles as possible obtained by means of such indents. At the same time, care should be taken not to purchase much in advance of actual requirements, if such purchase is likely to prove unprofitable to Government.

Where scales of consumption or limits of stores have been laid down by competent authority, the officer ordering a supply should certify on the purchase order that the prescribed scales or limits are not exceeded. Financial rules and regulations about the purchase of different kinds of goods, services, stationeries etc. are mentioned at G.F.R. under Section 143 to 147. Therefore, delegation of financial powers, circulars and orders should be followed by the respective agency before purchase of the goods and services. The government officers must follow

respective organogram (TO&E) for purchasing transport/ vehicle, machinery as per their entitlement.

According to financial rules the following preference should be given regarding purchase:-

1. Home made goods of acceptable quality ;
1. Home made goods manufactured by imported raw materials ;
2. Huge stock of foreign goods available in the country ;
3. Permitted importable goods.

Tender

Purchase should be made by inviting tenders. Normally there are three kinds of tenders such as: a) open tender, b) limited tender and c) single tender.

(a) Open Tender

If purchasable amount is above Tk.5000/- then open tender should be invited in at least two widely circulated national dailies. Open tender may be of (1) One Envelope Bidding System and (2) Double Envelop Bidding System.

Procurement should normally be carried our through One Envelope Bidding System. For example " The Technical" and The "The price" bids are submitted in one envelope. On the other hand Double Envelope bidding system bids alongwith bid securities are received from each bidder in two separate sealed envelopes, one for "Technical" and the other for "Price" with each envelope clearly marked. The bid security should be submitted in the technical envelope. The technical bids should be opened first and evaluated. After approval of the technical evaluation report, whose technical bids have been determined to be responsive. Then the executing agency should formally notify, giving at least 7 days time, such bidders about the date,

time and venue of opening of the price bids. The price bids of the bidders whose technical bids have been determined to be non- responsive should be returned un-opened along with their bid securities.

(b) Limited Tender

The procedure may be used for goods available from a limited number of qualified local suppliers when purchasable amounts is below Tk. 5000/-. In this case some qualified firm may be enlisted at the beginning of the financial year. In such a case advertising is not required, bids are invited preferably from an agreed short list of at least 3 (three) qualified enlisted bidders from the local area. It means 3 quotations are to be collected from qualified bidders.

(c) Single Tender

It is a simple shopping system when purchasable amount is not exceeding Tk 500/- the respective agency can purchase through a cash memo. In this case no quotation is to be required.

The Bidding Documents

The goods required, bidding procedures, and contract terms are prescribed in the bidding documents. In addition to the invitation for bids, the bidding documents include: (a) Instructions to Bidder, (b) Bid data sheet, (c) General condations of contract, (d) Special condition of contract, (e) Schedule of Requirements (Schedule), (f) Technical Specification, (g) Bid form and price schedule, (h) Bid Security form, (i) Contract form (j) performance Security form, (k) Manufacturing Authorization form.

Preparation of Bids: (a) Language of Bid, (b) Documents comprising the Bid, (c) Bid form, (d) Bid process, (e) Bid currencies.

Exceptions in case of open tender

Under the following circumstances open tender may not be invited for purchase of goods if the purchasable amount is being above Tk. 5000/- it can be purchased by limited tender.

(1) When open tender is not considered in a reasonable way for public interest. Generally if this becomes unprofitable, then the limited tender should be invited. In this case satisfactory argument is to be shown for inviting limited tender and for discouraging open tender.

(2) When requisitioning authority urgently required the goods within a very short time where formalities for open tender is not feasible.

Purchase goods from Autonomous Bodies

According to General Financial Rules part two under clause 6 purchase from autonomous body is possible with out quotation.

Purchase by Committee

Under the following causes purchase is possible by formation of a purchase committee:-

1. For urgent necessity ;
2. When no bids are available after repeated advertisement at least for 3 times ;
3. Purchase may be possible at the lowest price from the market if it is less than the quoted price.

Purchase committee should be formed by more than three officers. In this case honesty and integrity of these officers to be considered.

Prior plan for purchase of goods

The following formalities may be followed for purchase of goods through tender:

(A) Tender schedule is to be prepared with following conditions :-

(1) Conditions: (a) 2-½ % earnest money, (b) 10 % security money, (c) Fine for delay in delivery of goods (delay fine 1% maximum 10%), (d) Authority to accept or reject the tender.

(2) Offer to include (a) Trade License, (b) Financial certificate, (c) Income Tax certificate, (d) Bidders Experience certificate etc.

(3) Specification of goods/ materials

(4) Quantity of goods.

(5) Performance guaranty.

(B) Advertisement

In the advertisement of tender the following information must be incorporated: -

i) Availability of Tender Document ;
ii) Price of Tender Schedule (non refundable) ;
iii) Earnest Money 2. 50% (Refundable) ;
iv) Security Money ;
v) Place for submission of bids ;
vi) Last date for sale of schedule ;
vii) Last date for submission of bids ;
viii) Date and time for opening the Tenders ;
ix) Qualification of bidders ;
x) Short description of works ;
xi) Estimated cost of work ;
xii) Power to accept or reject by the competent authority.

Process of Tender

(a) Formation of Tender Committee (if not formed earlier)
(b) Preparation of comparative statement (C.S.)
(c) Collection of technical report (if necessary)
(d) Meeting of tender Committee.

Acceptance or rejections of tender

According to existing rules of the Government the executive agency should receive the lowest bid out of three or more qualified bids. Under clause 19 of the G.F.R. if lowest bid is not received by the executive agency there should be proper reasonable causes against it. Without any proper reasonable causes lowest bid should not be rejected. If lowest bid is not acceptable due to want of any supporting paper, the executive agency must communicate it to the lowest bidder for supplying the necessary documents. Purchase should be made in the most economical manner because it is the main objective of the Government policy. In case if any loss occurs due to negligence of the executive agency, the agency may be responsible for such loss.

Issuance of work order and Signing of the contract form

On the basis of the recommendation of the Tender Committee, the proper authority will approve the tender. Then the executive agency will issue work order to the successful bidder for delivering of goods and services and will sign a contract form both by the supplier and the purchaser.

Repeat work order

In order to meet additional requirements of goods, the executive agency may issue repeat orders to the successful bidder at the same unit price. In this case repeat order does not normally exceed one year.

Extension of time

If bidder can not deliver the goods in due time as per work order, the executive agency can not extend time with out the

reasons of natural disaster and emergency causes. But if the bidder falls to deliver the goods in due time without above causes then the executive agency will take the following one or more steps for financial interest of the office.

1) Cancel the contract and rest work should be done by invitation of fresh tender ;

2) Can impose fine from the bidders for financial loss of the office ;

3) May forfeit the earnest money and bidders may be black listed.

Sales Management process

Subject to any special rules or orders applicable to any particular department agencies, stores which are reported to be obsolete, surplus or unserviceable may be disposed of by sale or otherwise under the orders of the authority competent to sanction the writing off a loss caused by deficiencies and depreciation equivalent to their value.

Each order declaring stores as unserviceable should record the full reasons for condemning them and how the condemned stores are to be disposed of i.e. whether by sale, public auction or otherwise. The head of the office should record full particulars regarding all condemned stores in suitable list from which their disposal can be watched (under rules 167 of the G.F.R.).

According to delegation of financial power of the Government the head of the divisional office is the competent authority for disposal of unserviceable stores.

The value of condemnable items Tk. 20,000/- by the district level office and Tk.10,000/-by thana level office may be disposed off by sale or auction.

According to circular of the Establishment Ministry (Circular No. MER (TR) IP-6/83-843 dated 13/12/1986) every ministry, department and attached department will constitute a condemnation committee with 5 members for dispose of unserviceable transport and machines etc. Such kind of condemnation committee is headed by a Joint Secretary or equivalent officer of the concerned ministry/ departments.

Under the following circumstances the condemnation committee can recommend a vehicle unserviceable:-

a) If it is totally unprofitable for services by frequent repair ;

b) If it is not possible to get 1st Class service by repair whose cost is more than 50% of the actual cost ;

c) If two or more major units are unserviceable by general wearing ;

d) If spare parts are not available due to changes of Model ;

e) If frame is bent or twisted due to accident and one more main parts are totally destroyed ;

f) If it is off on road due to any kind of major defect.

On the basis of the recommendation of the condemnation committee, all ministries, departments should dispose of condemnable items by sale, public auction etc. In this case a reserve price must be decided before hand.

Stores Management

The stores should be in charge of one person who is known as the store keeper. The storekeeper / store officer should have echnical knowledge, wide experience in stores routine, capable of organising the operations of the stores.

Store keeper / officer should perform the following duties and responsibilities:-

1. Issue purchase requisition when reordering level is reached;
2. Storage layout should be determined for keeping the goods;
3. Check all incoming materials to ensure quality and quantity as per purchase order and goods Received Note;
4. Maintain the stores in a tidy, safe and convenient manner;
5. For identification and location a system of code number should be employed;
6. Issue stores against proper authorization in right quantity and quality and at the right time;
7. Maintain proper record of receipt, issue and balance;
8. Checking the Bin Card Balance with the physical quantities in the Bins;
9. Report on waste and scrap materials, obsolete stock etc.;
10. Prevent unauthorized persons from entering into the stores;
11. Protect/preserve stores as per direction of the higher authority;
12. Insecticides should be used to protect stores from rates, whiteant etc.

References :

Arefin, Md. Shamsul (1996) *Ayan O Bidhi.* Respected Mrs. Fatema Begum, 328, Agampur Uttara, Dhaka.

Banerjee Mr. H.B. (1977) *Cost Accounting.* Calcutta : World Press Private Limited.

G.F.R. Part I & II., Dhaka : B.G. Press.